Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

সব মামার সেরা
বিস্ক ক্লাব
মামা
ওয়েফার

ওয়ান্ডার

মাফিন কেক

চকলেটি স্বাদে ভরপুর

বাইটে বাইটে ওয়ান্ডার

কিআ কিশোর আলো

নভেম্বর ২০২৫, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩২
৫০ টাকা ● বর্ষ ১৩ ● সংখ্যা ২
www.kishoralo.com

দুটো গল্প এবং...

একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি। কোন চাবির তালা নেই?

উত্তর : কি-বোর্ডের কি। এগুলো চাবি বটে, তবে এসবের কোনো তালা নেই।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাঁর ‘আমার বোকা শৈশব’ নামের একটা বই আছে। তাতে তিনি ছোটবেলায় কী কী বোকামো করেছিলেন, সেসব লিখেছেন। একবার তাঁর বাবা তাঁকে তালা কিনতে বাজারে পাঠালেন। বালক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তালা কিনলেন, কিন্তু চাবি আনলেন না। কারণ, বাবা তাঁকে তালা কিনতে বলেছেন, চাবি তো কিনতে বলেননি। চাবি চাইলে যদি বিক্রেতা দাম বেশি চেয়ে বসেন!

তালা কিনলে চাবিও পাওয়া যাবে। এমন কোনো তালা বিক্রি হয় না, যার চাবি নেই। তেমনি পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা পাওয়া যাবে না, যার সমাধান নেই।

আচ্ছা, ১৩ নভেম্বর হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। তাঁর বই থেকে একটা কৌতুক বলি। ‘রিকশাওয়ালা, যাবেন নীলক্ষেত?’

‘যামু।’

‘কত ভাড়া?’

‘৫০ টাকা।’

‘কী বলছেন। ওই তো নীলক্ষেত দেখা যাচ্ছে? এত ভাড়া চাইছেন কেন?’

‘জায়গা দেখা গেলেই কাছে হয় না। আকাশের চান্দও তো দেখা যায়।’

এটাও একটা শিক্ষা বটে। গন্তব্য দেখা গেলেই কাছে হয় না। চোখের দেখা আর বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে। আমরা অনেক সময় কাজের শেষের অংশটুকু তাড়াহুড়া করে ফেলি। শেষটা দেখা যাচ্ছে, এই তো হয়ে যাবে। ধরো, একটা বৃত্ত আঁকতে গিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করতে গিয়ে যদি শেষ অংশটা সরল রেখা এঁকে ফেলি, তা আর বৃত্ত হবে না।

ধৈর্য, কল্পনা আর বাস্তবতাকে মিলিয়ে চলা—এসবই আমাদের জীবনে কাজে লাগে।

সম্পাদক : আনিসুল হক
সহযোগী সম্পাদক : আদনান মুকিত
জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক : আহমাদ মুদ্দাসসের
গ্রাফিকস : মাহ্‌বুব রহমান, রনী হোসেন
ম্যাগাজিন সমন্বয়ক : শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি
বিপণন ব্যবস্থাপনা : মো. মহিউদ্দিন রওনক
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : শামসুল হক

প্রচ্ছদ : সাদাত

প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ কর্তৃক মুদ্রিত।
যোগাযোগ : কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩ । ওয়েবসাইট : www.kishoralo.com
ই-মেইল : editor@kishoralo.com
ফেসবুক : fb.com/kishor.alo। ইনস্টাগ্রাম : instagram.com/kishoralo

পরিবেশক : প্রথমা ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

সূচিপত্র

ছড়া

৯ | ফেলফোবিয়া
আহমেদ সাব্বির

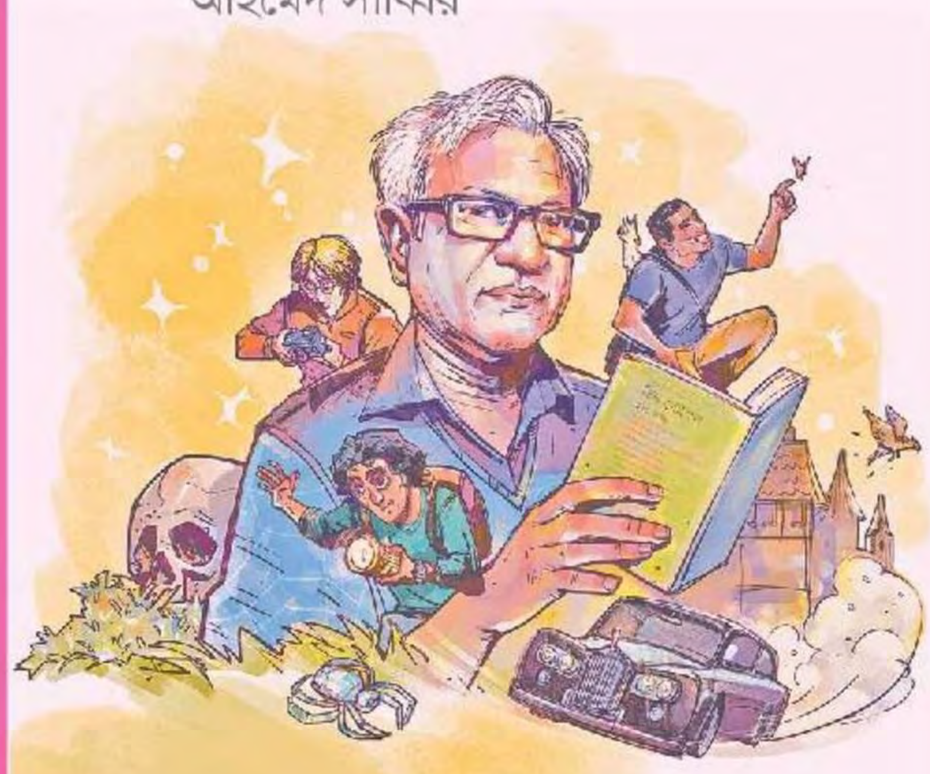

প্রচ্ছদ রচনা

১৬ | স্মৃতিতে রকিব হাসান
ইসমাইল আরমান

১৯ | একজন রকিব হাসান ও সেবা প্রকাশনীর গুগল
মাসুমা মায়মুর

২২ | জানা-অজানা রকিব হাসান
অনীশ দাস অপু

২৫ | রকিব হাসানের মহাপ্রয়াণ
আবদুল গাফফার রনি

গল্প

২৮ | দ্বৈরথ
নাবিল মুহতাসিম

৩৪ | গোয়েন্দা শামসু ও তিন বোতল তেল
আহমেদ রিয়াজ

৩৮ | বিকল্পী
রাফাত শামস

অর্জন

৪৪ | নোবেল পুরস্কার ২০২৫
যে কারণে নোবেল পেলেন তাঁরা

সাম্প্রতিক

৪৮ | ল্যুভর মিউজিয়ামে রুদ্ধশ্বাস সাত মিনিট
আহমাদ মুদ্দাসসের

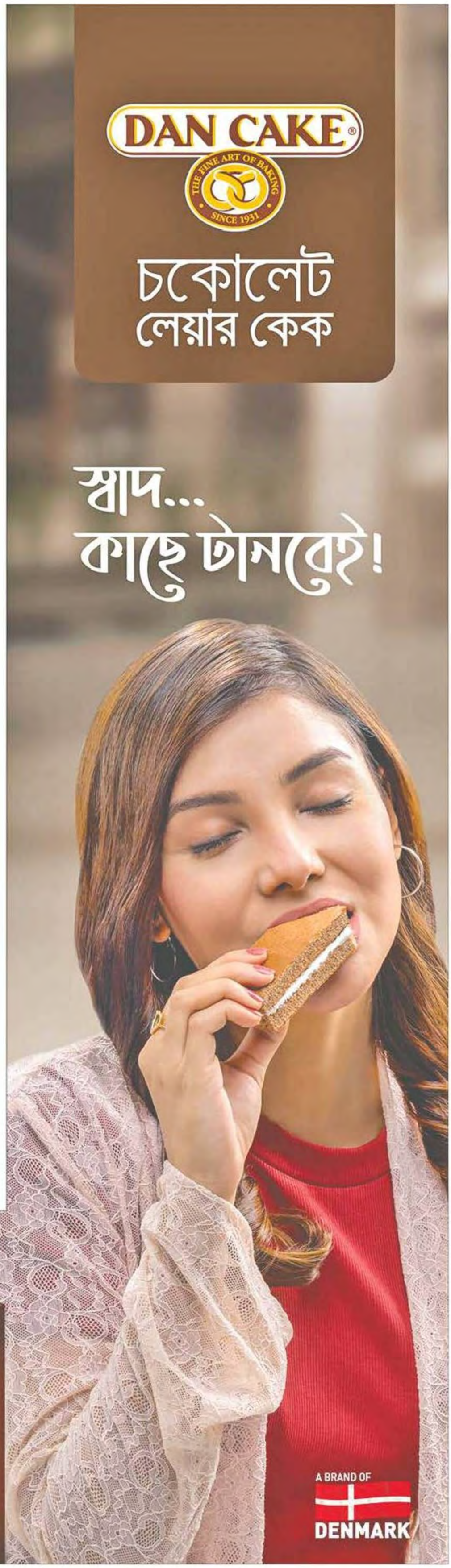

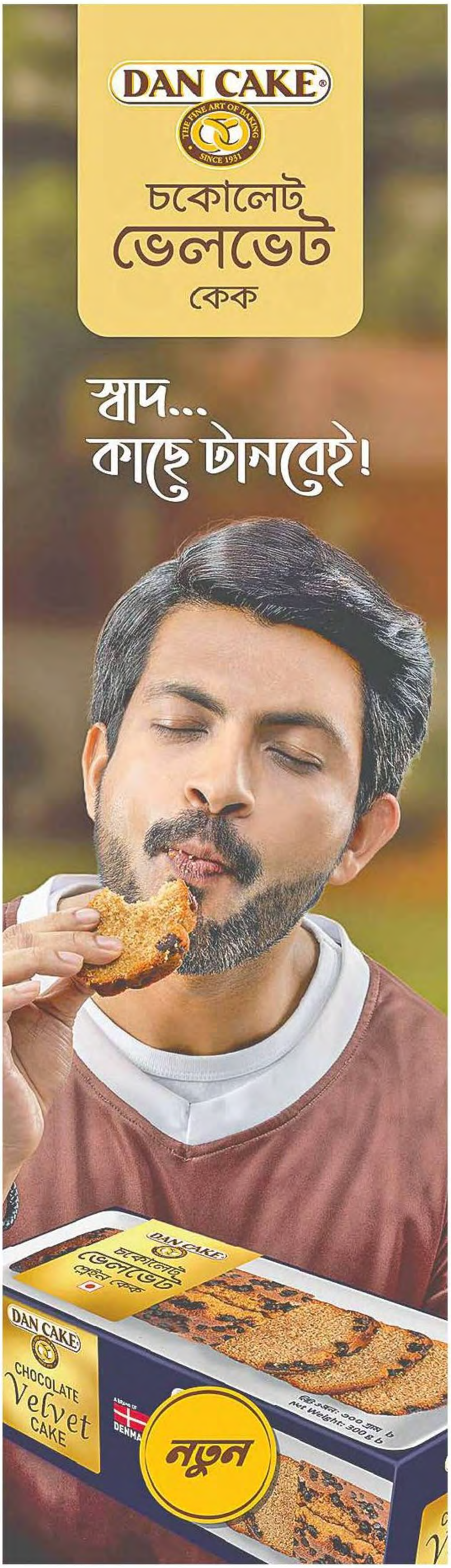

সূচিপত্র

অ্যানিমে কথন

৫০ | নিখোঁজ সময়ের অজানা আততায়ী
প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

প্রতিযোগিতা

৫৮ | ম্যাথ ক্যাঙারু : বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বাংলাদেশ
মুনির হাসান

খেলা

৬১ | আমার লড়াই শুধু আমার সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে নয়—মারুফা আক্তার
কাজী আকাশ

গেম

৭৭ | সবাই কেন রোব্লক্স খেলে
আসহাবিল ইয়ামিন

ধারাবাহিক কমিকস

৭০ | অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু
লেখা : আদনান মুকিত
আঁকা : সব্যসাচী চাকমা

৭৪ | কেমন করে উড়তে হয় না
ফাহিম আনজুম রুম্মান

কমিকস

৬৬ | টুটি আর ডাইনো
আঁকা ও লেখা : মেহেদী হক

৭২ | তাতা
বাসব রায়

৭৮ | চোখ
তানভীর আহমেদ

নিয়মিত বিভাগ

৬ | চিঠিপত্তর
১০ | লাখ টাকার কুইজ বিজয়ী
১২ | তোমাদের লেখা
১৮ | শব্দের খেলা
৫২ | জন্মদিন
৫৬ | স্বাস্থ্য
৩৬, ৯২ | আয়োজন
৬৪ | মিম
৮৮ | বুদ্ধির ব্যায়াম
৯০ | গণিতের ধাঁধা
৯২ | কিআড্ডা
৯৩ | কুইজ

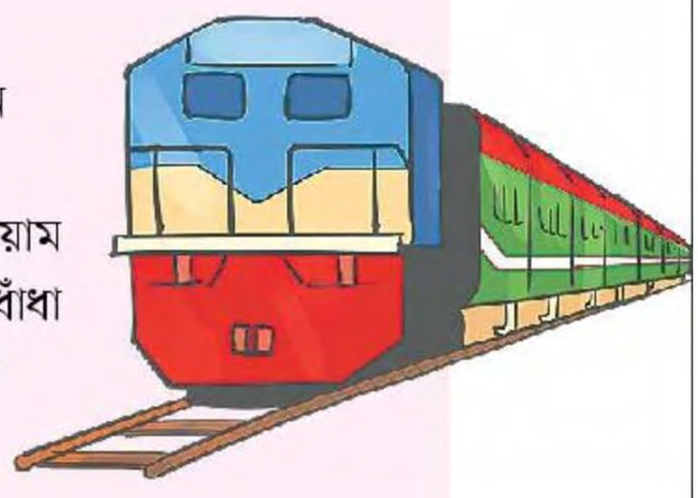

সুখী সফল জীবনের শত সূত্র

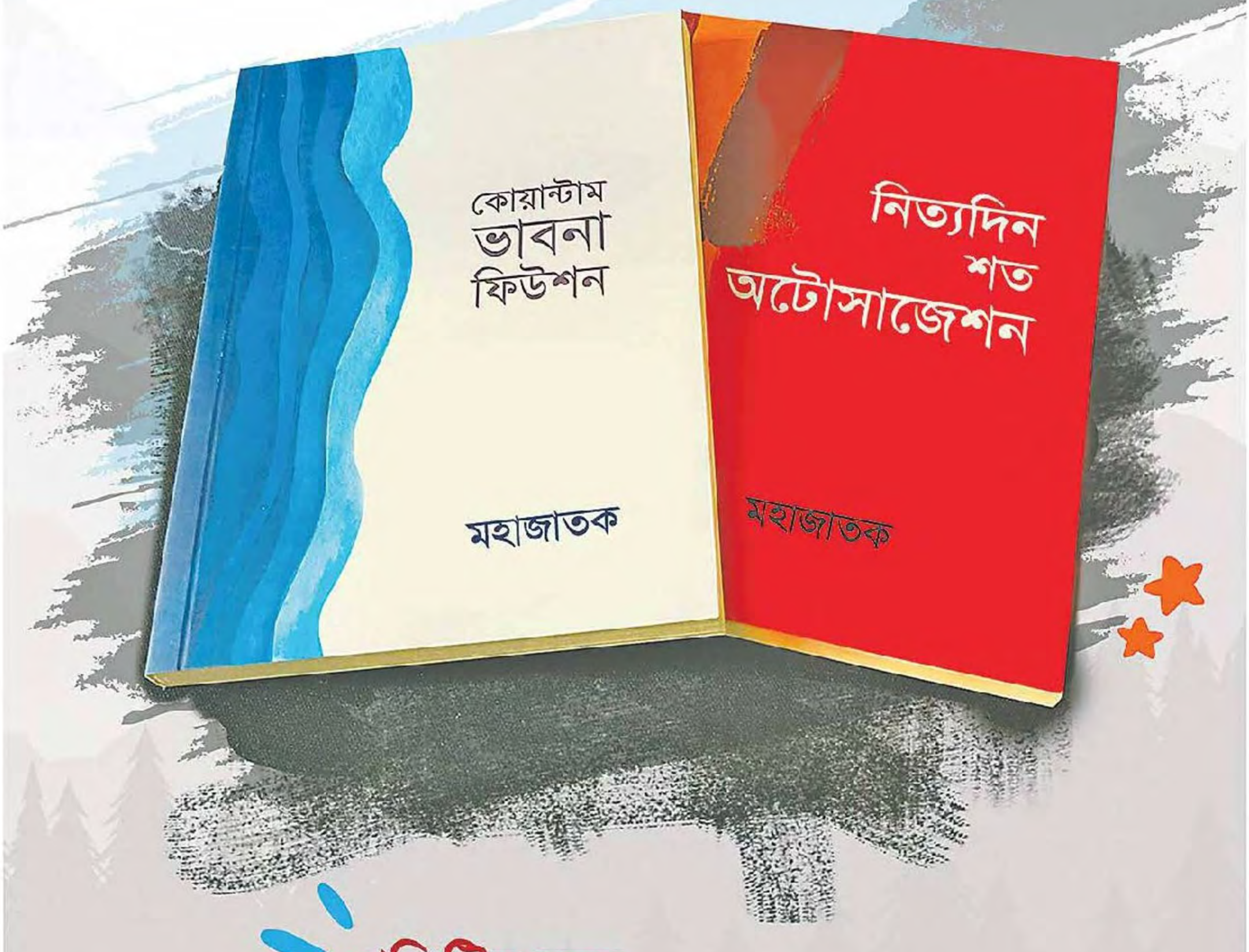

প্রতিটির মূল্য
৫৫ টাকা মাত্র

অর্ডার করুন
০১৩২৯৭৪৬৬০৪

quantummethod.org.bd

প্রিয় কিআ,

একদিন একটা অপরিচিত নম্বর থেকে আমার কাছে একটা কল এল। কল ধরার পর ফোনের ওপাশ থেকে কে যেন বলল, 'হাই, তুমি কি নাভা বলছ?' আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি কে? তিনি বললেন, 'আমি কে, তুমি চিনবে না। তবে আমি কিআর অফিস থেকে বলছি।' শুনে তো আমি অবাক। তিনি আরও বলতে থাকলেন, 'এই মাসে দেখলাম তুমি কিআতে চিঠি পাঠিয়েছ এবং সব কটি কুইজের উত্তরও পাঠিয়েছ। তোমার সব কটি কুইজের উত্তরই আমরা সিলেক্ট করেছি এবং সব কটির জন্যই তুমি গিফট পাবে। ওহ, আরেকটা কথা, আমার কল পাওয়ার পর যদি কোনো চিঠি লেখো কিআতে, তবে সেটাও ছাপা হবে।' তাঁর এসব কথা শুনে উত্তেজনায় তো আমি বলেই ফেললাম, আপনি সত্যি বলছেন? তাহলে প্রমিজ করেন আমার চিঠি কিআতে ছাপাবেন। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, প্রমিজ, ছাপা হবে।' এটা বলে তিনি কল কেটে দিলেন। কল কাটার পর যখন আমি বুঝলাম কী হয়েছে, তখন কী যে খুশি হলাম, তা তোমাকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু একি! ঠিক তখনই আম্মু আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কিরে, ঘুমের মধ্যে এভাবে হাসছিস কেন?' আমি আম্মুকে বললাম, আম্মু, কিআর অফিস থেকে কল এসেছিল। আম্মু আমার কথা পুরোপুরি না শুনেই বলল, 'সারা দিন কিআ কিআ করলে এমনই হবে। হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা খেতে আয়।' যখন বুঝলাম পুরো ব্যাপারটাই আমার স্বপ্ন, তখন আমার কী যে মন খারাপ হলো, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আরও মন খারাপ হবে যখন দেখব এ মাসেও আমার চিঠি ছাপা হয়নি। তাই বলি, বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে আমার চিঠিটা ছেপে আমাকে খুশি করো। সামনে আমার বৃত্তি পরীক্ষা। ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে। নিজের প্রতি খেয়াল রেখো। টা টা।

ফাইজা জাহান নাভা

অষ্টম শ্রেণি, নান্দাইল পাইলট গার্লস হাইস্কুল, ময়মনসিংহ

কিআ : যাক, স্বপ্নে দেওয়া একটা প্রমিজ তো সত্যি হলো। কী বলো? তোমার বৃত্তি পরীক্ষা খুব ভালো হোক। ঠিকমতো প্রস্তুতি নাও। আবার কথা হবে।

প্রিয় কিআ,

গুনে গুনে দ্বাদশে তোমার পদার্পণ। তোমায় যে শুভেচ্ছা জানাব, সে ফুরসত কই? সময়সীমা শেষ হওয়ায় চিঠি পাঠাতেই পারিনি। সে যাকগে, কয়েক দিন ধরেই তোমার শেষ সংখ্যা নিয়ে ভাবছি। ভাবতেই কেমন যেন ম্রিয়মাণ লাগে। আমি চাই আরও অনেক বারো পেরিয়ে, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ছাপিয়ে তুমি অক্ষয়িষ্ণু রয়ে যাও। কোনোকালে হয়তো প্রবীণ আমরা নবীনদের বলব, 'এই যে দেখতে পাচ্ছিস কিশোর আলো নামক একটা রঙিন কাগজের স্তূপ, এটা কিন্তু আমাদের নিছকই একটা বিনোদনের মাধ্যম ছিল না। এটা ছিল একান্তই আমাদের একটা রঙিন জগৎ। যার একেক পৃষ্ঠার একেক রং ছুঁয়ে দিত আমাদের মনঃকোকনদ। এই রঙিন জগতেই আমরা করতাম কত আবদার, রাগ, অভিমান। কত খুশি, আনন্দ-আহ্লাদে ভরপুর ছিলাম আমরা। কতশত প্রতিপাদ্যে মুখর ছিলাম। আমরা কখনোই কিশোর আলোকে "ম্যাগাজিন, ম্যাগাজিন" বলে চড়াও করতাম না। কিশোর আলো দিন শেষে কিশোর আলোই। ইশ্! একবার যদি আবার সেই মোহময় জগতে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেতাম।' ভবিষ্যতে এই আফসোসই আমি করতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে, কতখানি ধন্যবাদ তোমায় দিলে যে যৌক্তিক হবে, তা আমার অজানা। আমাদের এই শ্বাপদসংকুল সমাজে একঘেয়ে শৈশবগুলোকে 'আকাশের মতো বাধাহীন' করার মতো দুঃসাহসিক এক প্রতিপাদ্যে তুমি প্রত্যয়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের শৈশবটাকে কত নিঃশব্দভাবেই না তুমি অর্থবহ করে তুলছ। তুমি সত্যিই অদৃষ্টপূর্ব। আগামী দিনে তোমার প্রত্যুদ্গমন আরও শুভ হোক। শেষে বরাবরের মতোই একটা চাওয়া, কিআ, ভালো থেকো। অনেক এবং অনেক বেশি। কারণ, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে হৃতসর্বস্বতাগুলো যে আমাদের জেঁকে ধরবে!

ইচ্ছা

কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

কিআ : কেমন আছ? তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল রংপুরে, বিজ্ঞানচিন্তার অনুষ্ঠানে। মনে আছে? খুব সুন্দর লিখেছ তুমি। 'মনঃকোকনদ' শব্দটা বোধ হয় সর্বশেষ পড়েছিলাম মাইকেল মধুসূদনের কবিতায়। চমৎকার তোমার বাংলা শব্দচয়ন। নিয়মিত লেখা চাই তোমার কাছ থেকে। তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,

তুমি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল বানালে পাঠকেরা উপকৃত হবে। তাই আমি চাচ্ছি, তুমি হোয়াটসঅ্যাপে একটা চ্যানেল বানাও, যেন আমরা সহজে যোগাযোগ করতে পারি। ভালো থেকো কিআ!

মো. ত্বোয়াসিন বাশার সামি

পঞ্চম শ্রেণি, তাহযীবুল উম্মাহ মডেল মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ

কিআ : ভালো আইডিয়া দিয়েছ। তোমার চিঠি পেয়েই আমরা একটা চ্যানেল খুলেছি। কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে নয়, ইনস্টাগ্রামে। তোমরা এই চ্যানেলে জয়েন করলে আমাদের প্রতিদিনের আপডেট পাবে। চ্যানেলটার লিংক: https://www.instagram.com/channel/AbYxnCCpfh_1Y8V1/ দারুণ আইডিয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

প্রিয় কিআ,

কেমন আছ? জন্মদিন কেমন কাটল? আজ বেশি কিছু লিখব না। আচ্ছা, বাথরুম সিঙ্গার ও বাথরুম ড্যান্সারের মধ্যে পার্থক্য কী? কারণ, আমি একজন বাথরুম সিঙ্গার। প্রায়ই 'পাল পাল জিনা' গানটা গাই। আজ আর লিখব না। বিদায়।

ফারায হোসেন

চতুর্থ শ্রেণি, শাপলা কুঁড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

কিআ : এত কম লিখলে কেন? গান গাইতে যাবে এখন? বাথরুম সিঙ্গার আর ড্যান্সারের পার্থক্য খুব বেশি না। ধরো, 'পাল পাল জিনা' গানটা গাওয়ার সময় তুমি যদি বাথরুমে নাচো, তাহলেই তোমাকে বাথরুম সিঙ্গার ও ড্যান্সার—দুটোই বলা যাবে। জন্মদিন খুব ভালো কেটেছে। তোমার গান থাকলে আরও ভালো কাটত।

তোমার চিঠি ও লেখা পাঠাও এই ঠিকানায়

চিঠিপত্তর, কিশোর আলো
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল : editor@kishoralo.com
ফেসবুক : fb.com/kishor.alo
ওয়েবসাইট : www.kishoralo.com

প্রিয় কিআ,
আমি এই পাতলাপুতলা ম্যাগাজিনের দস্তুরমতো পুরোনো পাঠক। গত ১২ বছর ধরে আমি এর পাতা ওলটাচ্ছি। ছোটবেলায় পেছনের পাতার কমিকসের জন্য এই ম্যাগাজিনকে কোনো জহরতের চেয়ে কম মনে হতো না। কিন্তু কৈশোরে পা দেওয়ার পর সেটা ছোটখাটো একটা আলাউদ্দিনের চেরাগে রূপ নিল, যার স্পর্শে বহুদিন ধরে কল্পনা করা চিঠি পাঠানোর ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেল। নিজের আবেগ-অনুভূতিকে লিখে প্রিয় বন্ধুকে চিঠি পাঠানোর অনুভূতিটা কিআ না এলে কখনো জানাই হতো না। হাল জমানার ই-মেইলের কল্যাণে ব্যক্তিজীবনে চিঠির মর্ম কমে গেছে। এখন চাপে পড়ে তুমিও অমন ধারা চালু করলে কেমন হবে, শুনি? যদি এমন ট্র্যাজেডি হয়, তাহলে যে প্রীতম হাসানের গান উল্টে ভেঙে পড়তে হবে এভাবে! আর আমার পাঠক বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু চিঠি কুরিয়ার করতে পারো, সেটা তুলনামূলকভাবে সহজ। আশা করি, আমার মিষ্টি কথায় তোমার চিড়ে ভিজেছে। তবে চলি, কেমন! ভালো থাকবে, হে।
ফাবিহা হামিদ
বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

কিআ : ওপরের ছবিটা দেখো, এটা তোমাদের চিঠি নিয়ে বসার সময় আমার ডেস্কের ছবি। ফলে বুঝতেই পারছ, আমাদের কাছে চিঠির মর্ম কমেনি। ফলে চিঠি চলুক।

প্রিয় কিআ,
আশা করি, বরাবরের মতোই ভালো আছ। দেখে তো এখন হাসিখুশিই মনে হলো। তবে আমাদের দূরে রেখে জন্মদিনে একা একা মজা করলে; এটা কি ঠিক হলো বলো? একটু অভিমান তো করাই যায়। জানো কিআ, কিআতে সবার অভিজ্ঞতা পড়ে আমারও খুব ইচ্ছা হচ্ছিল কিআর জন্য কিছু করতে, আয়োজনগুলোতে অংশ নিতে। কিন্তু আমার ভাগ্যটাই খারাপ, তাই দূরে থেকে ইচ্ছাগুলোকে প্রতিবার সমাধিত করতে হয়। প্রতিবার ভাবি অনলাইন কিআড্ডায় অংশ নেব; কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় করে। এই অবাধ্য মনের বাসনাগুলোর সমাধান কী হতে পারে, বলবে? আর তোমার এবারের সংখ্যাটি অন্যান্য অক্টোবরের মতোই অনন্য ছিল। প্রচ্ছদটি আমার দারুণ লেগেছে। ভালো থেকো, কিআ, বিদায়।
মাইদা জারিয়াত
নবম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

কিআ : সেকি! ভয়ের কী আছে? তোমার মতো যারা নিয়মিত চিঠি পাঠায়, আমরা কিন্তু প্রতিটি অনলাইন আড্ডায় তাদের খুঁজি। যারা দূরে থাকো, সবাই অনলাইনে যুক্ত হলে আড্ডা আরও জমবে। আশা করি, পরের আড্ডায় তুমি থাকবে।

প্রিয় কিআ,
এটা আমার লেখা তৃতীয় এবং সর্বশেষ চিঠি। দুঃখজনক যে তুমি আমার আগের চিঠি দুটি ছাপাওনি। আমি মোটামুটি তোমার পুরোনো পাঠক বললে ভুল হবে না। ২০১৯ কি ২০২০ সাল থেকে তোমার পাঠক আমি।
আমার দুটি দাবি আছে!
দাবি-১ : 'নিজেকে জানো' বিভাগটা নিয়মিত করতে হবে।
দবি-২ : 'মনোবন্ধু' বিভাগ ফেরত চাইইই!
মুশফিকা জান্নাত বহ্নি
বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বগুড়া

কিআ : 'নিজেকে জানো' তো এখন মোটামুটি নিয়মিত বিভাগ। অক্টোবর সংখ্যাতেও ছিল। আবার সামনে থাকবে। মনোবন্ধুও ফিরে এসেছে সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। নিয়মিতই থাকবে সামনে। তোমার চিঠি ছাপাতে পারিনি বলে মন খারাপ কোরো না। আশা করি, এটা তোমার সর্বশেষ চিঠি হবে না। আরও চিঠি পাব আমরা।

প্রিয় কিআ,
আমি তোমার অনেক বড় ভক্ত। তোমার মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পারি। তোমার মাধ্যমে আমি অনেক বিনোদনও পাই। জানো, আমি না *দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি* পড়তে খুব পছন্দ করতাম। এটা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি অনেক মন খারাপ করেছি। আদনান মুকিত স্যার যেন আবার কোনো মজার ধারাবাহিক উপন্যাস লেখেন। আমি ছবি আঁকতে পছন্দ করি। তোমাকে একটি ছোট্ট ছবি পাঠালাম। আমি পাখি পছন্দ করি। আমার দুটি ককাটেল, একটি লাভবার্ড আর তিনটি বাজরিগার আছে। ভালো থেকো, কিআ। আর সব সময় আমাদের আনন্দ দিয়ো।
ফারিয়া তাবাসসুম
ষষ্ঠ শ্রেণি, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি গার্লস স্কুল, ঢাকা

কিআ : তোমার জন্য নিশ্চয়ই আবার নতুন ধারাবাহিক শুরু হবে। অপেক্ষা করো। তুমি তোমার পাখিগুলোকে নিয়ে ছবিসহ লেখা পাঠাতে পারো। আমার মনে হয়, অনেকেই তোমার মতো পাখি পোষে। তাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তোমার আঁকা ছবি খুব সুন্দর হয়েছে। আরও ছবি পাঠিয়ো।

প্রিয় কিআ,

তোমাকে আমি ভালো আছ কি না, তা জিজ্ঞেস করব না। আমি তোমার একজন আড়াল পাঠক, আমি তোমাকে তিন বছর আড়ালে পড়ে আসছি, কখনো চিঠি দিইনি। আজ মন চাইছে, তাই চিঠি লিখলাম। প্লিজ আমার চিঠি ছাপাবে। না হলে আর সামনে আসব না তোমার, বলে রাখলাম। প্লিজ...প্লিজ।

ফারহান আহমেদ জিহান

এসএসসি পরীক্ষার্থী, মৌলভীবাজার সরকারি স্কুল, মৌলভীবাজার

কিআ : চিঠি ছাপা হয়েছে। এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো প্লিজ।

প্রিয় কিআ,

জন্মদিনের সীমাহীন শুভেচ্ছা। যদিও একটু দেরি হয়ে গেল! তোমার ১২ বছর হলো, আমারও এ বছর ১২ হলো। তুমি কি এবার কোনো গিফট কার্ড পেয়েছ? আমি একটি কার্ড পাঠিয়েছি তোমাকে। আসলে আমি তোমাকে কী দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই এই সিম্পল কার্ড দিয়ে উইশ করলাম। কিন্তু যে ভালোবাসা দিয়ে কার্ডটি তৈরি করেছি, তা সিম্পল হয় কীভাবে! এর আগে যখন তোমাকে চিঠি পাঠিয়েছি, মনে হয়েছে আমি আবোলতাবোল লিখেছি, তাই ছাপোনি। এবার কোনো ভুল হলে এড়িয়ে যেয়ো। তোমার কাছে আমার কিছু আবদার আছে। দুটি প্রশ্নও আছে।

আবদার-১ : তোমাকে রকিব হাসানের 'তিন গোয়েন্দা'র 'ডেথ সিটি' সিরিজ দিতে হবে। (প্লিজ)

আবদার-২ : অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস (শুধু রাজনৈতিক নয়) নিয়ে একটা লেখা দিয়ো।

আবদার-৩ : শাহরিয়ার খানের কমিক ধারাবাহিকভাবে দিয়ো।

জানো কিআ, আমি তোমার অনেক পুরোনো পাঠক। তোমার সঙ্গে পরিচয় হয় ২০১৯ সালে। ও হ্যাঁ, প্রশ্নগুলো হলো—

১. কার্ডটি তোমার কেমন লেগেছে?

২. পৃষ্ঠাসংখ্যা বেশি করলে কী হয়? (নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। না হলে এত বন্ধুর (পাঠক) কথা তুমি রাখবে না, তা তো হয় না)।

আজ এ পর্যন্তই। অনেক বেশি লিখে ফেললাম। আবদার আর প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলে খুশি। কার্ডটি গ্রহণ করলে তার চেয়েও খুশি হব। বিদায় (আপাতত)।

রাঈসা জাহান

ষষ্ঠ শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

কিআ : তোমার কার্ডটা খুব সুন্দর হয়েছে রাঈসা। কার্ডটা এত সুন্দর হয়েছে যে কিআর একজন সদস্য সেটা বাসায় নিয়ে গেছে সাজিয়ে রাখার জন্য। অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা উপহারের জন্য। এটা এবারের জন্মদিনের অন্যতম সেরা উপহার। তোমার অনেকগুলো আবদার আর প্রশ্ন আছে। সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি। 'ডেথ সিটি' আমরা ছাপতে পারব না, যেহেতু এটা এরই মধ্যে প্রকাশিত এবং অনুমতির ব্যাপার আছে। বাকি দুটো আবদার পূরণের চেষ্টা করব। আর শেষ প্রশ্নটার উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া কঠিন। তবু বলি, বেশি পৃষ্ঠা হলে আমাদের খরচও বেশি হবে। সেটার জন্য আরও বেশি বেশি বিজ্ঞাপন নিতে হবে। পত্রিকা ছাড়াও কিআ প্রকাশের জন্য বেশ বড় একটা খরচ হয়। সেটা চালানো কঠিন হয়ে যাবে। এটাই কারণ, অন্য কিছু নয়।

প্রিয় কিআ,

আজ অনেক দিন পর তোমাকে লিখতে বসলাম (তাই বলে এটা ভেবো না যে অনেক দিন পর তোমাকে পড়তেও বসেছি)। তুমি তো বেশ আনন্দেই আছ। কারণ, গত মাসে তোমার জন্মদিন ছিল। কিন্তু তোমার পাঠকেরা যে মোটেও আনন্দে নেই, তার খবর কি তুমি রাখো? জানো, আমাদের স্কুলে একটা ক্লাস টেস্ট শেষ হতে না হতেই আরেকটা শুরু হয়ে গেছে, যার ২০ শতাংশ আবার বার্ষিক পরীক্ষাতে যোগ করা হবে। তাই পড়াশোনায় এমন চাপে পড়ে গেছি যে কী বলব! তবে এত ব্যস্ততার মধ্যেও তোমাকে পড়তে কিন্তু আমার একদমই সমস্যা হয় না। অক্টোবর সংখ্যার গল্পগুলো কিন্তু অসাধারণ ছিল! প্রতিটি গল্পই পড়তে পড়তে যেন ভিন্ন কোনো জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কাছে একটা আবদার আছে (এই প্রথম আবদার)। 'ক্যারিয়ার ভাবনা' নিয়ে একটা ফিচার ছাপিয়ো। আর জন্মদিনে কী কী উপহার পেলে, সেটাও জানাতে ভুলো না কিন্তু! সামনেই বার্ষিক পরীক্ষা, তবু পাঠ্যবইকে সরিয়ে তোমাকে লিখতে বসেছি। এবার বিদায় জানাতে হবে, নয়তো পাঠ্যবই আমাকে বিদায় জানিয়ে দেবে! ভালো থেকো বন্ধু।

মো. আরাফ ইসলাম

নবম শ্রেণি, মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

কিআ : ভালো বিষয় তুলে ধরেছ। আমরা প্রায়ই শুনি তোমরা লেখাপড়ার চাপে পিষ্ট। পড়াশোনা করতে গিয়ে তোমরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হও, জানাতে পারো। আমরা তাহলে বুঝতে পারব তোমাদের কষ্টটা। অক্টোবর সংখ্যার গল্পগুলো ভালো লেগেছে জেনে ভালো লাগল। মাথায় থাকবে 'ক্যারিয়ার ভাবনা'র কথাও। আপাতত বার্ষিক পরীক্ষাটা ভালোমতো দাও। তারপরই তো উল্লাস!

কিআ প্লেলিস্ট

তোমাদের সঙ্গে নিজের প্লেলিস্ট শেয়ার করেছে ঢাকা স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এর পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মুহতাসিম মুস্তফা রাফিফ।

তোমরাও তোমাদের প্লেলিস্ট শেয়ার করতে পারো আমাদের সঙ্গে।

মোহ	- আফটারম্যাথ
ঘুম	- অড সিগনেচার
কদম	- ব্লু জিন্স
স্টারবয়	- দ্য উইকেন্ড
ডার্কসাইড	- অ্যালান ওয়াকার

এ মাসের সভা 'কিআড্ডা' হবে অনলাইনে।
নিবন্ধন ফরম পাবে এই লিংকে।
www.kishoralo.com/1q2bxmiy94
এসএমএস পেলে সময়মতো উপস্থিত থেকো অনলাইন সভায়।

অলংকরণ : **নাইমুর রহমান**

ফেলফোবিয়া

আহমেদ সাব্বির

ব্যাপার খুবই রহস্যময়
অদ্ভুতুড়ে ভয়ের
পরীক্ষাটা সামনে এলেই
পেট খারাপ হয় জয়ের।

ইংরেজিতে তিথির ভীতি
চার্জ কমে যায় কানের
বাংলা নিয়ে দুশ্চিন্তায়
জ্বর আসে সাদমানের।

অঙ্ক দেখে রিংকু কাঁদে
ডিম নাকি সে ভিতুর!
ভূগোল পরীক্ষার রাত্রে
হেঁচকি ওঠে জিতুর।

বিজ্ঞানে ভয় আরাফাতের
প্রযুক্তি ভয় প্রভার
ইফতি ইতিহাসের রাতে
ভান ধরে সে বোবার।

কর্মমূখীর কষ্টে রনির
চোখ হয়ে যায় ট্যারা
কৃষিতে মিম ঘুমের ঘোরে
গুনতে থাকে ভেড়া।

সব বিষয়ে দক্ষ অরিন
খুব নাকি স্কলার
চারুকলার চক্রে পড়ে
স্বর বসে যায় গলার।

ভুগছে ওরা ফেলফোবিয়ায়
সংগত ভয় পাওয়াই
কোন কবিরাজ পারবে দিতে
ফেল্টু রোগের দাওয়াই!

অলংকরণ : **এস এম রাকিব**

লাখ টাকার পুরস্কার পেল যারা

কিশোর আলোর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল দুটি কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রথমটি ছিল 'চিঠির ধাঁধা', যা গত ১ অক্টোবর উইটোন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সৌজন্যে *প্রথম আলো*র পাতায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি হলো 'লাখ টাকার কুইজ', যা এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের সৌজন্যে প্রকাশিত হয় ৮ অক্টোবর কিশোর আলোর অক্টোবর সংখ্যায়।

এই দুই কুইজ সারা দেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে। শত শত পাঠক *প্রথম আলো*র 'চিঠির ধাঁধা' ও কিশোর আলোর কুইজের প্রশ্নের কুপন কেটে নিজেদের নাম, ঠিকানাসহ পাঠায় কিআর ঠিকানায়। চিঠির ধাঁধায় ছিল খুব সহজ শূন্যস্থান। শূন্যস্থান পূরণের জন্য ছিল প্রচলিত কিছু ছবি। যেমন কেকের ছবি দিয়ে বোঝানো হয়েছে জন্মদিন। জ্বলন্ত মোমবাতির ছবি দিয়ে বোঝানো হয়েছে আলো।

আবার কিশোর আলোর লাখ টাকার কুইজের প্রশ্নগুলো ছিল বেশ সহজ—যেমন 'কিশোর আলোর ওয়েবসাইটের ঠিকানা কী?' বা 'হিমু চরিত্রটি কার সৃষ্টি?' এমন সহজ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাঠিয়ে অনেকেই হয়েছেন বিজয়ী।

এই দুই কুইজের বিজয়ী নির্ধারণে ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় কিশোর আলো কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় একটি ঘরোয়া লটারি অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক, জনপ্রিয় অভিনেতা ইয়াশ রোহান, উপস্থাপক ও মডেল রুহানী এবং গীতিকার কবির বকুল। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত, জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের, কিশোর আলোর প্রদায়ক আব্দুল ইলা ও নওশিন শারমীন। তাঁরা একে একে বিজয়ীদের নাম লটারির মাধ্যমে বাছাই করেন।

'চিঠির ধাঁধা' কুইজে বিজয়ী হয়েছেন ১১ জন। প্রথম পুরস্কার হিসেবে একজন পাচ্ছে একটি আইপ্যাড, আর বাকি ১০ জনের প্রত্যেকে পাচ্ছে ১ হাজার টাকার বই।

অন্যদিকে কিশোর আলোর লাখ টাকার কুইজে প্রথম পুরস্কার হিসেবে একজন পাচ্ছে একটি ল্যাপটপ, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে একজন পাচ্ছে একটি ট্যাব, আর বাকি ২০ জনের প্রত্যেকে পাচ্ছে ১ হাজার টাকার বই।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে উইটোন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের সৌজন্যে। বিজয়ীদের নাম প্রকাশ করা হলো পরের পৃষ্ঠায়। বিজয়ীদের সঙ্গে দ্রুতই যোগাযোগ করা হবে।

কিআ প্রতিবেদক

সৌজন্যে

ENVOY TEXTILES LIMITED
World's 1st Denim Plant with LEED® Platinum Certification

কিআ কিশোর আলো

লাখ টাকার কুইজ বিজয়ী

প্রথম পুরস্কার বিজয়ী

১টি ল্যাপটপ

মো. আজমাইন ফিদা
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী

১টি ট্যাব

মো. দানিয়াল ফেরদৌস গালিব
আইডিয়াল ক্যাডেট কলেজ, লালমনিরহাট

তৃতীয় পুরস্কার

বিজয়ী ২০ জনের প্রত্যেকে পাবে ১ হাজার টাকার বই

রুমাইশা রউফ রাফিয়া
একে স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মো. রাজিত বিন তৌহিদ
নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

মুনতাহা আরিবা
বটমলী হোম বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

ফারিহা যুনাইনাহ
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

ত্বাবীর ইসলাম তুবা
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

হাসনিন জাহিন
সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর

মুহসিনা তাইয়্যেবা
শাহীন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ফেনী

নিঝুম রায়
দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর

মো. অনন্ত সরকার
সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আফসা আফরিন
বার্ড হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট

সাবিরা শাহরিয়ার রাকা
চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল, ঢাকা

রিজুওয়ান বিল্লাহ
খাজা আজমেরী কিন্ডারগার্টেন স্কুল, চট্টগ্রাম

জান্নাতুল ফেরদৌস
নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নেত্রকোনা

ফাতিহা ইসলাম আজমি
ভোলা আব্দুর রব স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভোলা

তাসফিয়া আক্তার
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, ঢাকা

সাবাউন নূর রাইফ
মির্জা স্কলার্স একাডেমি, সিলেট

মাহমুদুল হাসান রাইহান
লাকসাম সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, কুমিল্লা

মুনতাকা আফরোজ সুবা
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী, ঢাকা

আরশান আসাদ
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সিদরাতুল মুনতাহা ফাইজা
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

চিঠির ধাঁধা বিজয়ী

১টি ট্যাব/আইপ্যাড বিজয়ী

সামিয়া তাবাসসুম
দিনাজপুর

বিজয়ী ১০ জনের প্রত্যেকে পাবে ১ হাজার টাকার বই

আহনাফ উজমা মায়িদা, নড়াইল
ফারজানা ইসলাম, চাঁদপুর
ইসরাত জাহান শোভা, ভোলা
হুমায়রা জান্নাত অর্পি, সিলেট
সাইফান সাদিক, ঢাকা
আরিয়া জান্নাত ওহী, বরিশাল
সৌমিকা নন্দী, কিশোরগঞ্জ
জান্নাতুল ফেরদৌস রুহামা, রংপুর
আনিজা ফারজিন হোসেন, ঢাকা
জাবির আবদুল্লাহ, ঢাকা

সৌজন্যে

WHEATON INTERNATIONAL SCHOOL

কিশোর আলো

তোমাদের লেখা

আমরা সবাই রাজা

• গল্প

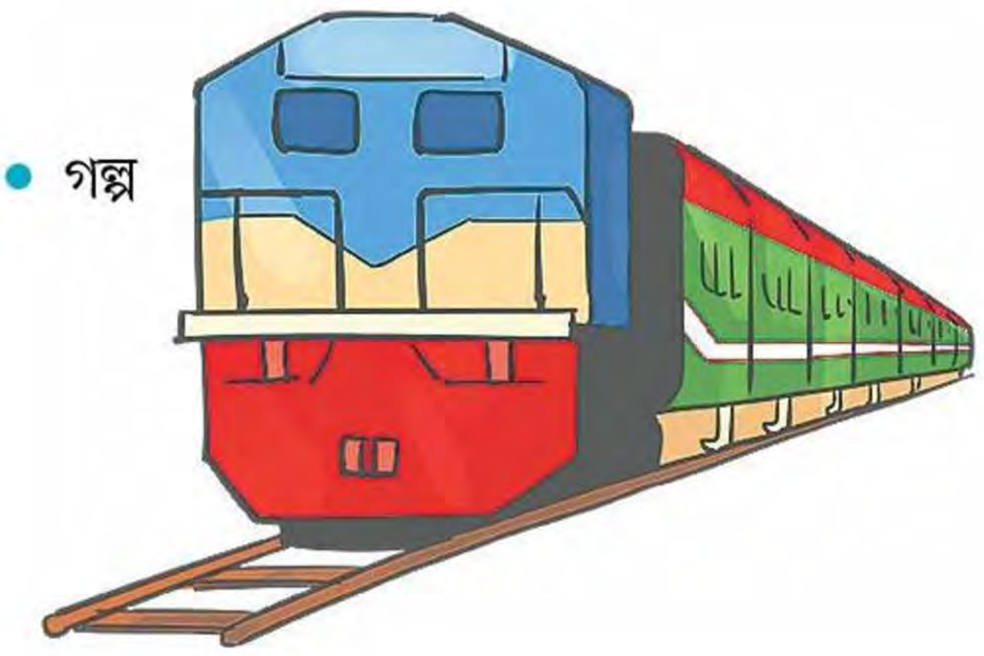

সেই সকালটা

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দা সরাতেই দেখি, আকাশে মিষ্টি রোদ, যেন পুরো পৃথিবীটা হাসছে। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করছিল। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল, 'আজ ভিন্ন কিছু একটা করি!'

মা তখন রান্নাঘরে চা বানাচ্ছিলেন, আমি বললাম—

'মা, আজ একটু বের হব।'

'তুই সকালে রোদ দেখলেই বের হবি?' হেসে বললেন মা।

'আজকের রোদটা বিশেষ মনে হচ্ছে।' আমি মুচকি হেসে বললাম।

চা খেয়ে আমি হাঁটতে বের হলাম। রাস্তার ধারে বাতাসে গাছের পাতা দুলছে, পাখিরা ডাকছে। পুরো দৃশ্যটা একটা সিনেমার মতো লাগছিল। হঠাৎ দেখি, ছোট্ট একটি ছেলে রাস্তার পাশে কাগজের ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

আমি থেমে গেলাম। বললাম, 'ঘুড়িটা আমাকে দাও। আমি ঠিক করে দিই।'

ঘুড়িটার সুতা একটু কেটে নতুন করে বাঁধলাম, তারপর বাতাসে ধরিয়ে দিলাম। আর কী, এবার দারুণভাবে উড়ল! ছেলেটার মুচকি হাসি দেখে মনে হলো, আমার নিজের ঘুড়িই উড়ছে।

এরপর আমি রিকশায় করে নদীর ধারে গেলাম। ওখানে হালকা বাতাস, সূর্যের আলোতে নদীর পানি ঝলমল করছে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম, নিজের মাথার ভেতর শান্তি অনুভব করছিলাম।

মনে হচ্ছিল, এমন সাধারণ দিনগুলোই তো আসলে সবচেয়ে সুন্দর।

মশিউর রহমান মাহির

অষ্টম শ্রেণি, সামসুল হক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শেষ ট্রেন

রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। কলেজ থেকে ফেরার পথে ট্রেন মিস করে ফেলল শুভ। বাধ্য হয়ে তাকে সেই পুরোনো লাইনের শেষ ট্রেনটি ধরতে হলো। এই লোকাল ট্রেন খুব কম মানুষই ব্যবহার করে। স্টেশনটা শহরের একদম প্রান্তে, নাম 'শ্যামনগর হাল্ট'।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই কেমন একটা ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। আশপাশে কেউ ছিল না, কেবল একটা ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আলো জ্বলছিল। শুভ একটা ফাঁকা কামরায় উঠে পড়ল। চলতে শুরু করল ট্রেন। জানালার বাইরে গাঢ় অন্ধকার, মাঝেমধ্যে গাছের ছায়া দ্রুত সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ঠান্ডা, ভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল শুভ—

'তুমি কি শ্যামনগরের ছেলে?'

চমকে উঠে পাশে তাকাল শুভ। এক বৃদ্ধ বসে আছেন। গায়ে ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখ দুটো অস্বাভাবিক গভীর। শুভ মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি কলেজে পড়ি, আমার বাড়ি বারাকপুরে।'

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, 'এই ট্রেনটা... জানো তো, অনেক দিন আগে এই লাইনে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল। মাঝরাতে একটা ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে অনেক মানুষ মারা গেছিল। সেই থেকে কেউ আর এই শেষ ট্রেন ধরতে চায় না।'

শুভ অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, 'আমি জানতাম না... আজই প্রথম এই লাইনে উঠলাম।'

বৃদ্ধ আবার হাসলেন। 'এই ট্রেনে যারা ওঠে, সবাই অবশ্য জানে না; কিন্তু কিছু মানুষ... থেকে যায়।'

'মানে?' শুভ অবাক হয়ে বলল। হঠাৎ সে দেখল, পুরো কামরাটা ঘন কুয়াশায় ভরে গেছে। জানালার কাচে ভেতর থেকে হাতের ছাপ, যেন কেউ ভেতর থেকে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করছে। আরও ঠান্ডা হয়ে উঠল পরিবেশ। শুভ চিৎকার করে উঠে পড়ল। কিন্তু কামরার দরজা বন্ধ। মুঠোফোনে নেটওয়ার্ক নেই। বৃদ্ধ তখন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'তুমি এখন চুপ করে বসে থাকো,' বৃদ্ধের গলা যেন বাতাসে কেঁপে উঠল, 'গন্তব্য এসে গেছে।'

হঠাৎ একটা তীব্র ঝাঁকুনি। ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। কোনোমতে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল শুভ। চারদিক একেবারে নিঃস্তব্ধ। ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল, কিন্তু ধীরে ধীরে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সেটা!

পেছনে তাকাতেই স্টেশনের বোর্ডে লেখা দেখতে পেল শুভ 'শ্যামনগর স্টেশন (বন্ধ)'। তার নিচে ছোট করে লেখা—২০০১ সালের এক দুর্ঘটনার পর স্টেশনটি বন্ধ হয়ে গেছে।

শেষ কথা

শুভ আজও সেই রাতের কথা ভুলতে পারেনি। বাস্তবে কেউই জানে না সেই 'শেষ ট্রেন' কীভাবে এসেছিল বা কে ছিলেন সেই বৃদ্ধ। তবে শ্যামনগরের স্টেশন যে ২০ বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা তো রেকর্ডেই লেখা আছে।

ফারহান আহমেদ জিহান

এসএসসি পরীক্ষার্থী, মৌলভীবাজার সরকারি স্কুল, মৌলভীবাজার

আমাদের অদ্ভুত ফ্যামিলি ২

স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে দেখি, আম্মু থমথমে মুখে ডাইনিং টেবিলে বসে আছে। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই আম্মু বলল, আব্বু ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে বাসায় ফিরছিল। এক পকেটমার আব্বুর টাকাটা চুরি করে নিয়েছে। কথাটা শুনেই আমার ভীষণ মন খারাপ হলো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে আব্বুর কাছে চলে গেলাম। আব্বু আমাকে দেখে বলল, 'টাকাটা চুরি হয়ে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে রে।'

'কী ভালো হয়েছে, আব্বু?' আমি বললাম।

'তোর আম্মু তো সব সময় কড়কড়ে টাকার নোট আনতে বলে, এবার বান্ডলের নোটগুলো ময়লা ছিল। তোর আম্মু দেখলে তো অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি করত।'

আমার ক্ষীণ সন্দেহ হলো, আব্বু অতিরিক্ত শোকে পাথর হওয়ার পরিবর্তে 'পাগল' হয়ে গেল কি না! বিকেলে মামা অফিস থেকে ফিরতেই আম্মু চটজলদি মামাকে সব ঘটনা বলল। মামা আব্বুকে বলল, 'দুলাভাই, আপনার তো এই ঘটনার জন্য পার্টি দেওয়া উচিত।'

আমি প্রথমে ভাবলাম, মামা মনে হয় ভুল শুনেছেন।

তাই আমি মামাকে বললাম, 'মামা, আব্বু ৫০ হাজার টাকা হারিয়ে ফেলেছে, ৫০ হাজার টাকার লটারি জেতেনি।'

মামা বলল, 'হ্যাঁ, ওইটার জন্যই তো বলছি। দেখ, যদি টাকাটা কোনো ছিনতাইকারী দুলাভাইকে ছুরি মেরে নিত, তাহলে দুলাভাইয়ের অনেক বড় ক্ষতি হতে পারত। কিন্তু আল্লাহর রহমতে দুলাভাইয়ের শুধু ৫০ হাজার টাকাই গেছে। এটাই তো অনেক। তোকে আর অত ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। বুঝলে বুঝপাতা, না বুঝলে তেজপাতা! আমি বরং পার্টির জন্য বাজারটা করে আনি।'

আমি প্রথমে অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তারপর ভাবলাম, আমার পরিবারের সদস্যদের কাছে তো এটাই বাস্তব।

মারিয়া ইসলাম মিম
দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী

প্রিয় শীত

বাতাসে শীতের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শীত আসি-আসি করছে। ইদানীং সকালে হালকা কুয়াশার লুকোচুরি দেখা যায়। আকাশও দিন দিন ধূসর নীলে পরিণত হচ্ছে।

যদিও শীত আমার প্রিয় ঋতু নয়, তবু শীতের প্রতি আমি গভীর মমতা অনুভব করি। শীতকালের আকাশ, বাতাস সবই যেন আমার খুব পরিচিত। বছর ঘুরে সেই পরিচিত অনুভূতির সঙ্গে মিলিত হতে আমার অন্তরে খুশির দামামা বেজে ওঠে।

শীতকাল এলেই মনে পড়ে, আগে শুধু অপেক্ষার প্রহর গুনতাম, কখন বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবে আর আমরা নানুর বাড়িতে যাব। কাজিনদের সঙ্গে বসে চা খাওয়া, রোদ পোহানো, ব্যাডমিন্টন খেলা—এসবের যে আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এখন হয়তো স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করেছি, তবু সেই অপেক্ষা আগের মতোই আছে।

শীতের কুয়াশাময় সকাল, ধূসর আকাশে নীলের খেলা, মিষ্টি সোনালি রোদের উঁকিঝুঁকি, গরম গরম পিঠার ধোঁয়া, কম্বলে মুড়ি দিয়ে আকাশকুসুম কল্পনা করা—এই সবই শীতকালের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড।

তুমি চলে এসো, প্রিয় শীত। আশা রাখছি, এবারে তুমি হবে আরও সুন্দর, সুন্দর এবং সুন্দর।

সামিয়া ইসলাম তানভী
একাদশ শ্রেণি, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার

মনে পড়বে

'নাহ্, এখানেও নেই। কোথায় যে রেখেছি কাগজটা,' হতাশ হয়ে বললাম আমি। কোথাও খুঁজে পেলাম না। বিরক্ত হয়ে বসে পড়লাম অনেক পুরোনো আমলের ছোট পড়ার টেবিলের সামনে থাকা চেয়ারে। হঠাৎ চোখ পড়ল নিচের ড্রয়ারটির দিকে। মনে হলো, এখানে তো কাগজটা খুঁজে দেখিনি। 'না, থাকার কথা নয়। তাও একবার দেখি,' মনে মনে ভাবলাম।

মেঝেতে বসে ড্রয়ার খুলে খোঁজা শুরু করলাম। পুরোনো বই, অপ্রয়োজনীয় কাগজের স্তূপ ছোট্ট ড্রয়ারটিতে ঠাসা। বিরক্ত হয়ে সব বের করতে করতে হঠাৎ মনে হলো, একধরনের চিকন বই একটার পর একটা বের করছি, যেন শেষই হচ্ছে না। আশ্চর্য! এগুলো কোন বই? কবে কিনেছি? অবাক হলাম।

বইগুলোর ভান্ডার থেকে একটি হাতে নিয়ে প্রচ্ছদের দিকে তাকালাম। হঠাৎ যেন মস্তিষ্কের কোণে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা একটা স্মৃতি বেরিয়ে এল, যখন আমি বইগুলোর জন্য পাগল ছিলাম, হাতে পেয়েই খুশিতে লাফিয়ে উঠতাম। খেয়াল করলাম, চোখ ভিজে গেছে সেই আনন্দময় শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে।

এগুলো কোনো সাধারণ বই নয়, এগুলো সেই কিশোর আলো! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। সেই কাগজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে কিআগুলো নিয়ে বসে পড়ল সুদূর ভবিষ্যতের আমি।

সিরাজুম মুনিরা তাসফিয়া
অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম

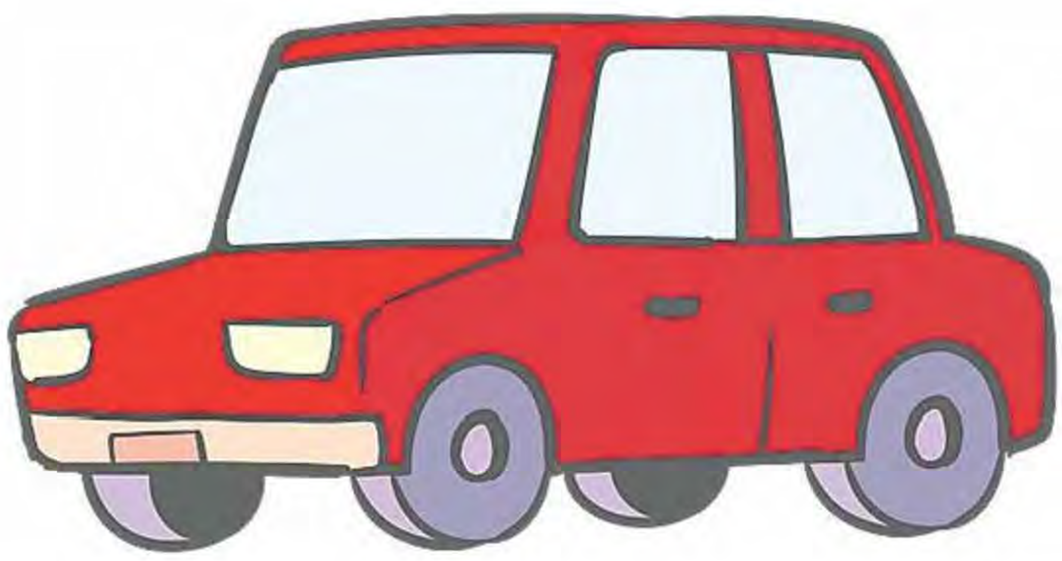

অচেনা রাস্তায় আমরা

গত বছরের ঘটনা। ঈদুল আজহার আগের দিন আমরা তিন ভাইবোন (আমি ও আমার প্রথম শ্রেণিতে পড়ুয়া দুই ভাই-বোন) দাদুর বাড়িতে যাচ্ছিলাম। প্রতিবছরই আমরা দাদুর বাড়িতে কোরবানি করি। গরু কেনার পর গরুটা দাদুর বাড়িতেই রাখা হয়। আমার কাজিন আর চাচিরা সব দেখাশোনা করে।

আমরা কোনো বছরই আমাদের গরুকে ভালোভাবে দেখতে পারি না। প্রতিবছরই ঈদের দিন দাদুর বাসায় যেতাম। আর যেতে না যেতেই আব্বু আর চাচারা মিলে গরুকে বাঁধতে শুরু করতেন। তাই গত বছর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ঈদের আগের দিনই আমরা দাদুর বাড়িতে চলে যাব।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। গাড়িতে উঠে আব্বু-আম্মুকে বিদায় দিয়ে আমরা তিন ভাইবোন দাদুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। যেহেতু এর আগেও আমরা তিনজন আব্বু-আম্মুকে ছাড়া অনেক জায়গায় গেছি, তাই অভিজ্ঞতা ছিল।

যখন আরেকটু এগোলেই দাদুর বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কথা, তখনই ড্রাইভার আমাদের তিনজনকে অবাক করে দাদুর বাড়ির রাস্তা দিয়ে না গিয়ে অন্য রাস্তায় গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলল। আমরা তিনজনই ভয় পেয়ে গেলাম। ড্রাইভারকে বারবার বলছিলাম, এটা আমাদের বাড়ির রাস্তা নয়। সে তো আমাদের কথা শুনলই না, বরং গাড়ির আয়নায় আমাদের ভয় পেতে দেখে হালকা হালকা হাসতে লাগল।

একে তো অচেনা রাস্তা, তার ওপর ড্রাইভারের গুন্ডা ধরনের চেহারা, সঙ্গে তার এই প্রতিক্রিয়া—সব মিলিয়ে আমাদের ভয় তিন গুণ বেড়ে গেল। যদিও ব্যাগে মুঠোফোন ছিল, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই অচেনা রাস্তার সবাই মনে হয় তার চেনা, সবার সঙ্গে সে কথা বলছিল।

পাঁচ-সাত মিনিট এভাবেই কেটে গেল। পরক্ষণেই দেখতে পেলাম, আরেহ! এই তো সামনে দাদুর বাড়ি! গাড়িটি বাড়ির সামনে এসে থামল। এতক্ষণ পর মনে হলো যেন আমরা প্রাণ ফিরে পেলাম।

এরপর ড্রাইভার আবার হাসি দিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করল, এটা আমাদের বাড়ি কি না। আমরা 'হ্যাঁ' বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। দেখলাম দাদু সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আব্বুর কাছ থেকে খবর পেয়ে হয়তো আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আব্বু আগেই গাড়ির ভাড়া দিয়ে ফেলেছিলেন, তাই আমাদের আর দিতে হয়নি।

এরপর বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর দাদুকে সব ঘটনা খুলে বললাম। দাদু তো হাসতে হাসতে শেষ। বললেন, ওই রাস্তায় গরুর হাট বসেছিল বলে আমাদের অন্য রাস্তা দিয়ে এনেছে। তখন মনে পড়ল, আরে হ্যাঁ, তা-ই তো! অন্য রাস্তায় যখন গাড়ি ঘুরিয়েছিল, তখন দেখেছিলাম, আমাদের রাস্তায় গরুর হাট বসেছে। দুশ্চিন্তায় ভুলেই গেছিলাম।

আব্বুকেও কল করে পুরো ঘটনা জানালাম। শুনে আব্বুও হাসতে লাগলেন। অন্য রাস্তার কথা আমাদের নাকি বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছিলেন। আর এতেই কিনা এত কিছু হয়ে গেল।

এখনো মনে পড়লে হাসি পায়, ড্রাইভার কী ভেবেছিল আমাদের এই অবস্থা দেখে! তাই তো হাসছিল বারবার, আর আমরা কিনা কত কী ভেবে বসেছিলাম...!

মেহনাজ আলম সামিয়া
দশম শ্রেণি, রাউজান আর আর এসি মডেল সরকারি হাইস্কুল, চট্টগ্রাম

কী ওটা!

২০২৪ সালের কথা। শীতকাল তখন। আমি মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছি। ঘড়িতে তখন রাত আনুমানিক ১২ : ৫৫ মিনিট। রাতের খাবার খেলাম, শুয়েই গায়ে কম্বল জড়িয়ে কানে ইয়ারফোন গুঁজে ভূত এফএমের একটা পর্ব ছেড়ে দিলাম। ততক্ষণে সবাই লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। শীতকাল হওয়ায় বিছানার চারপাশে মশারি টাঙানো ছিল।

আমি ভূত এফএম শুনতে শুনতে বারবার মেঝের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যেন মেঝেতে কেউ আছে! কিন্তু নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম যে এটা কিছু না, ভূত এফএম শুনছি, তাই ভয় ভয় লাগছে। এভাবে অনেকটা সময় কেটে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন আমি আবার মেঝের দিকে তাকালাম, তখন দেখলাম, এক জোড়া সবুজ চোখ আমার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

চিৎকার শুনে সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে? আমি সব খুলে বললাম। অমনি (ছোট মিমি) তখন বিছানা থেকে নেমে লাইট জ্বালাল, কিন্তু কেউ কিছুই খুঁজে পেল না। তারপর সবাই আমাকে বলল, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে।

গভীর রাত, ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তখন আবার আবছা চোখে দেখলাম, সেই সবুজ চোখ জোড়া আমার দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। ভয়ে আমি আমার পাশে থাকা দিদনকে (দিদিমা) ডাকলাম এবং বললাম যে আবার আমি ওই জিনিসটা দেখেছি। দিদন আমাকে ঘুম ঘুম স্বরে বললেন, 'ওটা কিছু না। ঘুমিয়ে পড়ো।' আমি দিদনের কথামতো ঘুমানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার মনে অজানা একটা ভয় থেকেই গেল।

পরের দিন সকালে খুঁজে বের করা হলো যে ওটা ছিল একটা বিড়াল;
কোনোভাবে ফ্ল্যাটে
ঢুকে পড়েছিল।
তারপর আর কী!
সবাই আমাকে
নিয়ে মজা
করল।
এমনকি
আমার আট
বছরের ছোট
বোনটাও আমাকে
নিয়ে মজা করল!

অন্নপূর্ণা সাহা
নবম শ্রেণি, গভর্নমেন্ট
ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ময়মনসিংহ

‘ভয়ং...কর’ রাজ্যে আমার প্রবেশ

কিশোর আলোর ২০২৪ সালের নভেম্বর সংখ্যায় ‘ভূত রাজ্যে আমার প্রবেশ’ শিরোনামে একটা লেখা দিয়ে বলেছিলাম, ভূতদের আরেকটা শহর পরিদর্শনে যখন যাব, সেই অভিজ্ঞতাও তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। তাই আবার চলে এলাম। চলো, এবারের অভিজ্ঞতাটাও একটু বিস্তারিত বলি।

এবার আমি গেছিলাম ‘ভয়ং...কর’ নামের শহরটিতে। এটা হলো ভূতেদের সবচেয়ে পুরোনো ও অবহেলিত শহর। কোনো উন্নতিই হয়নি এখনো শহরটার। আমিই ভূত সরদারকে বলেছিলাম, ‘গতবার যেহেতু রাজধানী দেখতে গেছিলাম, এবার একটু গ্রাম এলাকাটা ঘুরতে চাই।’

বরাবরের মতোই আমার সঙ্গে দুজন গাইড ছিল। আগেরবার যারা ছিল, তারাই—লম্বু ভূত ও বাচাল ভূত। প্রথমেই একটা বাড়িতে ঢুকলাম আমরা। ভূতদের গ্রামের বাড়ি আসলে কেমন হয়, সেটাই দেখার উদ্দেশ্য আমার! দেখলাম এক বুড়ি মা দূরে বসে হাত নেড়ে তার চামচ, পাতিল ও চুলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। সম্ভবত রান্না করছিলেন।

আমাকে দেখে তিনি উঠে এলেন। আমি যে মানুষ, তা বুঝলেন তিনি। আমাদের সবাইকে যত্ন করে বসালেন। হালকা নাশতা করালেন। বললেন তাঁর দুঃখের কথা। বুড়ো বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাঁকে নাকি ভূতের সনদ দেওয়া হয়নি। পৃথিবীর হালচালও তিনি জানতে চাইলেন। ওখানেই আমার বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল।

এরপর আরও কিছু দেখার জন্য যখন বের হলাম। বুড়ি মা তাঁর সেলাই করা একটি রুমাল আমাকে উপহার দিলেন। ওনার ব্যবহারে আমি এত খুশি হলাম যে আমার চোখে পানি চলে এল।

এরপর ঠিক করলাম একটা দোকানে যাব। দোকান থেকে কিছু একটা কিনে বুড়ি মাকে উপহার দেব। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। তাই গাইড দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি দোকানের দিকে গেলাম।

অন্ধকার একটা রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, তখন আমাকে ধরল চার ডাকাত। ভূতদের গ্রামে যে ডাকাত থাকবে, তা আমি কখনো ভাবিনি! আমার সঙ্গে তো কিছুই ছিল না, কিন্তু ওরা গাইড দুজনকে ভয় দেখিয়ে তাদের সবকিছু ব্যাগে ভরে ফেলল। আমি তাদের কিছু দিতে পারছি না বলে তারা আমাকে মারধরের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন আমার দুই ভীতু, অকর্মণ্য গাইডের মধ্যে একজন মিনমিনিয়ে বলল, ‘ডাক্কু ভাতি (ভূত+ভাই=ভাতি), ইনারে ছাইড়ে দ্যান। ইনি “অতিথি”।’

তখন ডাকাতগুলো বুঝল যে আমি মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাদের মুক্ত করে দিল! তারা অতিথিকে কখনো অসম্মান করবে না।

শেষমেশ আমি যখন বুড়ি মায়ের জন্য একটা চাদর কিনলাম, আমার ফেরার সময় হয়ে গেল। চাদরটা গাইড দুটোর হাতে দিয়ে হয়তো বলতে পারতাম যেন তারা বুড়ি মাকে সেটা দিয়ে দেয়। কিন্তু আমি আসলে নিজের হাতেই ওটা দিতে চাচ্ছিলাম! তাই দুই গাইড ভূতকে বিদায় জানিয়ে রুমাল আর চাদর হাতে পৃথিবীতে ফিরে এলাম।

আমি চাদরটা বুড়ি মাকে দিতে আবার সেই এলাকায় যেতে চাই। দেখি ভূত সরদার রাজি হয় কি না! যদি সে রাজি হয়, তাহলে হয়তো সেই গল্পও তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। তোমরা কি তা চাও?

নাজিফা নাওয়ার
সপ্তম শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

আমি আর লেখাই দেব না

শিরোনামে লেখা বাক্যটি আমাকে খুব জোর করে লিখতে হয়েছে। একেবারে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি এ পর্যন্ত যতবার লেখা দিয়েছি, ঠিক ততবারই কিশোর আলোয় ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগটি উধাও! প্রথম দুবার ভেবেছি, ‘ঠিক আছে।’ তা-ই বলে সব সময়!

আমার লেখা থাকুক বা না থাকুক, অন্যদের লেখা তো থাকবে। অন্তত আমি লেখা দিলেই যে ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগটা উধাও হয়ে যায়, এই ভাবনা যেন মাথায় না আসে। তাই এবার আমার এই ভাবনা ভুল না ঠিক, সেটা যাচাই করতে চাই। যদি সত্যি হয়, তবে আর কীই-বা করার আছে? লেখা নাহয় নাই-বা দিলাম। অন্তত ভালো ভালো লেখা পড়তে তো পারব, তাই না?

ইসরাত জান্নাত
নবম শ্রেণি, নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নরসিংদী

স্কুলের ভূত

তখন আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। একদিন আমি আর আমার বান্ধবী সারিকা স্কুলের দোতলার করিডরে হাঁটছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে একটা রুমের দিকে আমাদের চোখ পড়ল। রুমটার দরজা সামান্য খোলা ছিল। ভেতরে বেশ অন্ধকার। আমরা স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছি, তখনো সব রুম ভালোভাবে চিনতাম না। কৌতূহলী হয়ে আমরা দুজনই সেই রুমে ঢুকে পড়লাম।

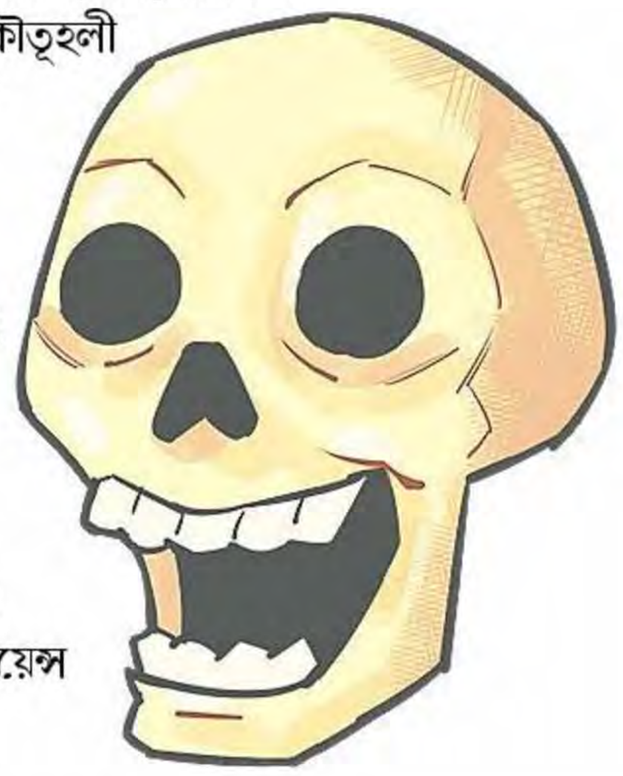

কোন রুম বুঝে ওঠার আগেই আমি কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি তা দেখার জন্য তাকাতেই দেখি, ৩২টি দাঁত বের করে একটি কঙ্কাল আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ভয়ে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। পরে জানতে পারলাম, ওটা ছিল সায়েন্স ল্যাবরেটরি।

উম্মে ইয়ামিন নিদ্রা
দশম শ্রেণি, বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বগুড়া

অলংকরণ : **সব্যসাচী চাকমা**

প্রচ্ছদ রচনা

স্মৃতিতে রকিব হাসান

ইসমাইল আরমান

১৯৮৫ সালের শেষ বা ১৯৮৬ সালের শুরুর দিকের কথা। তারিখটা ঠিক খেয়াল নেই, তবে মনে আছে, পরীক্ষা শেষে স্কুলের ছুটি চলছিল তখন। সারা দিন বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করি, কিন্তু সন্ধ্যাটা কাটতে চায় না; কারণ, করার কিছু নেই। বিটিভি ছাড়া আর কোনো চ্যানেল ছিল না তখন, সেখানে সন্ধ্যা বা রাতে ছোটদের কোনো অনুষ্ঠান থাকে না। গল্পের বই পড়ার ঝোঁক ছিল আমার, কিন্তু বাবার চাকরির সুবাদে আমরা তখন থাকি নীলফামারীর সৈয়দপুরে, প্রত্যন্ত সেই এলাকায় পছন্দসই বই পাওয়া প্রায় অসম্ভব, দৈনিক পত্রিকাই পৌঁছায় এক দিন দেরিতে। কাজেই নিজের ছোট্ট সংগ্রহের পুরোনো বইগুলোই বারবার পড়ে সময় কাটাতে হয়। বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম একেবারে।

সামনের বাসায় থাকত আমার প্রিয় এক বন্ধু। ওর বড় ভাই ক্যাডেট কলেজে ক্লাস এইটে পড়েন; একদিন শুনলাম, তিনি ছুটিতে এসেছেন। ওই বাসায় গিয়ে দেখি, ছুটিতে আসার সময় তিনি দুটো গল্পের বই কিনে এনেছেন—নিউজপ্রিন্টে ছাপা দুটো পেপারব্যাক বই। বইয়ের চেহারাসুরত দেখে খুব যে মুগ্ধ হলাম, তা নয়; কিন্তু ভাইয়া বললেন, খুব ভালো বই, পড়ে দেখো; তাই নিয়ে এলাম একটা বই...যেহেতু পড়ার মতো আর কিছু পাচ্ছি না। বইটার নাম—*মমি*। 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজের পঞ্চম বই। বাসায় ফিরে নিতান্ত হেলাফেলায় পড়তে শুরু করলাম বইটা। কিছুদূর যেতেই মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। একি কাণ্ড! ছোটদের বই এত সুন্দর...এত রোমাঞ্চকর হতে পারে? পড়া শেষ হতেই আবার ছুটে গেলাম ভাইয়ার কাছে। দ্বিতীয় বইটাও নিয়ে এলাম। কিশোর ক্ল্যাসিক সিরিজের *চিতা*। অনুবাদ করেছেন ওই 'তিন গোয়েন্দা'রই লেখক। দ্বিতীয়বারের মতো মুগ্ধ হলাম তাঁর লেখা পড়ে।

সেবা প্রকাশনী, 'তিন গোয়েন্দা' আর রকিব হাসানের সঙ্গে সে-ই আমার প্রথম পরিচয়। আমার পুরো কৈশোরই ছিল এদের নেশায় আচ্ছন্ন। এমন বহুদিন গেছে, যখন লেখাপড়া আর খেলাধুলা বাদ দিয়ে শুধু 'তিন গোয়েন্দা' পড়েছি। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একের পর এক 'তিন গোয়েন্দা'র বই কিনেছি। এমনকি ঘুমের ভেতরেও স্বপ্ন দেখতাম, রকিব হাসান কোনো নতুন বই লিখছেন আর আমাকে পড়তে দিচ্ছেন পাণ্ডুলিপিটা। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

মনে পড়ে, *রহস্য পত্রিকা*র কোনো এক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তাঁর একটা রঙিন ছবি। পরে আরেক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তাঁর সাক্ষাৎকার। অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলো। তবে বাস্তবে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক পরে, সম্ভবত '৯৬ বা '৯৭ সালের দিকে। তত দিনে সেবা থেকে আমার বই বেরিয়ে গেছে, *রহস্য পত্রিকা* আর *কিশোর পত্রিকা*তেও টুকটাক লেখা শুরু করেছি। বলে রাখা ভালো, আমার লেখক হওয়ার পেছনেও রকিব হাসানের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর লেখা পড়তে পড়তেই একই ধরনের কিছু লেখার শখ হয়েছিল, ফলে জন্ম নিয়েছিল অয়ন-জিমি চরিত্র দুটি। 'তিন গোয়েন্দা'র আদলে তৈরি করা দুজন কিশোর গোয়েন্দা...যারা একই ধাঁচের রহস্য সমাধান করে।

রকিব ভাইয়ের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন-তারিখ খুব পরিষ্কার মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, তাঁর সঙ্গে কীভাবে দেখা করা যাবে, জানতে চেয়েছিলাম। ওখানকার ম্যানেজার সাহেব বললেন, উনি তো *রহস্য পত্রিকা*র সহকারী সম্পাদক, রোজই আসেন; একটু বসুন, এলেই দেখা করিয়ে দেব। *রহস্য পত্রিকা*র কাজ হয় পাশের আরেকটা কামরায়; আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি ওখানে অপেক্ষা করব, নাকি উনি এলে কেউ খবর দিয়ে যাবে? ম্যানেজার সাহেব হেঁয়ালি করে বললেন, এখানেই বসুন, উনি এলে আপনা-আপনি খবর পেয়ে যাবেন। সত্যি সত্যি তা-ই ঘটল। খানিক পরে শুনতে পেলাম, কুমিল্লার ভাষায় চড়া গলায় হইচই, পুরো অফিস যেন নড়েচড়ে উঠল তাতে। ম্যানেজার সাহেব মুচকি হেসে বললেন, ওই যে, এসে গেছেন রকিব হাসান। সব সময় একটু উঁচু গলায় কথা বলতেন তিনি। যেখানেই যেতেন, চারদিকে খবর হয়ে যেত।

যাহোক, গিয়ে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। দীর্ঘ কোনো আলাপ হয়নি সেদিন। আমার কাছে রকিব ভাই শুধু জানতে চেয়েছিলেন, আমি বিশেষ কোনো সিরিজ থেকে কাহিনি অ্যাডাপ্ট করি কি না। মৌলিক লিখি শুনে একটু অবাক হয়েছিলেন, এটা মনে আছে। এরপর তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় গল্প আর বিশেষ এগোয়নি। পরেও অনেক দিন একটু দূরত্ব বজায় রেখেছি, তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সাহস হয়নি। *রহস্য পত্রিকা*য় লেখালেখির সূত্রে মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হতো, একবার তিনি আমার কাছে ফিচারও চেয়েছিলেন, কিন্তু ওই ধরনের লেখায় আমি অভ্যস্ত নই বলে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল—তাঁর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন বলতে এ-ই।

এই দূরত্ব ঘুচে গেল ২০০৬-০৭ সালের দিকে। ঘোচালেন তিনি নিজেই। তত দিনে রকিব ভাই সেবা ছেড়ে বাইরের বিভিন্ন প্রকাশনীতে লিখতে শুরু করেছেন। সেবায় আসা-যাওয়া অনেকটাই অনিয়মিত। মাঝেমধ্যে কপালজোরে দেখা হয়ে যায়, তখন তিনি নিজেই গল্প জুড়ে দেন। সেবা প্রকাশনীর খবরাখবর নেন, বইপত্র নিয়ে আলোচনা করেন, স্মৃতিচারণা করেন...এভাবে তিনি নিজেই কাছে টেনে নিলেন আমাকে। একপর্যায়ে ফোনেও কথা হতে শুরু করল তাঁর সঙ্গে। দেখাসাক্ষাতে দীর্ঘ বিরতি পড়ে গেলে তিনি নিজেই ফোন করেন কিংবা আমি ফোন করি। কখনো কোনো রেফারেন্সের জন্য, কখনো বইয়ের খোঁজে, আবার কখনো নিছক গল্প করার জন্য।

বলে রাখা ভালো, রকিব ভাইয়ের সঙ্গে সব আড্ডাই হতো বই বা লেখালেখিকেন্দ্রিক। প্রচণ্ড বইপাগল এক মানুষ, অন্য কিছু নিয়ে তাঁকে বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখিনি কখনো। প্রচুর বই পড়তেন, মাথায় লেখালেখি নিয়ে নিত্যনতুন আইডিয়া ঘুরত সব সময়। কথা বলতেন অকপটে, রাখঢাক করতেন না। সেবা প্রকাশনীর বিখ্যাত বহু সিরিজের পেছনে রয়েছেন তিনি। 'তিন গোয়েন্দা' তো বটেই; ক্ল্যাসিক বইয়ের অনুবাদ, ওয়েস্টার্ন, শিকার কাহিনি, টারজান, 'আলিফ লায়লা', 'আজব', 'রোমহর্ষ', 'গোয়েন্দা রাজু' ইত্যাদি সিরিজের অনেকগুলোই তাঁর নিজের লেখা কিংবা তাঁর আইডিয়া থেকে শুরু করা হয়েছিল। এ ছাড়া ছায়ালেখক হিসেবে 'মাসুদ রানা' সিরিজের কয়েকটি বই তিনি লিখেছেন, সেই সঙ্গে সিরিজটির বিখ্যাত অনেক বইয়ের মূল কাহিনি তিনি সরবরাহ করেছেন। সারা জীবনে রচনা করেছেন ৪০০-এর বেশি বই! সংখ্যাটা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো।

রকিব হাসানের এই বিপুল লেখালেখি নিয়ে একবার আলোচনা হয়েছিল শ্রদ্ধেয় কাজী আনোয়ার হোসেন, মানে কাজীদার সঙ্গে। আমি জানতাম, একসময় অন্তত তিনটি ছদ্মনামে লিখছিলেন তিনি, অথচ তখন রকিব হাসান নামটা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। কাজীদার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তাহলে অন্য নামে বই ছাপানোর কারণ কী? তিনি তখন মুচকি হেসে বলেছিলেন, রকিব এত বেশি লিখছিল যে আমরা তাল মেলাতে পারছিলাম না। নাম একটাই রাখলে দেখা যেত, সারা মাসে যত বই বেরোচ্ছে, সবই রকিব হাসানের

লেখা। পাঠকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই রকিব হাসানই প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের নামে বইগুলো প্রকাশ করতে। নিজের ওপর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর—জানতেন, অন্য নামে ছাপা হলেও বই ঠিকই চলবে এবং তা-ই ঘটেছিল।

রকিব হাসানের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল তাঁর লেখার ভাষায়। সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠিত ভাষার ভেতরেই নিজস্ব আরেকটি ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি, যা ছিল বাকি সব লেখকের চেয়ে আলাদা। সাদামাটা কাহিনিও তাঁর ভাষার গুণে হয়ে উঠত অনবদ্য। এ ছাড়া তিনি ভালোবাসতেন এক্সপেরিমেন্ট করতে। 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজেই গোয়েন্দা কাহিনির পাশাপাশি তিনি আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন অ্যাডভেঞ্চার, সায়েন্স ফিকশন, হরর, এমনকি ফ্যান্টাসি ধারার কাহিনি। তাঁর লেখার গুণে সব ধরনের কাহিনিই মানিয়ে যেত 'তিন গোয়েন্দা'য়। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ বিষয়ে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন তিনি, চান লেখায় বৈচিত্র্য আনতে, যাতে পাঠক একঘেয়েমিতে আক্রান্ত না হয়। সুপ্রতিষ্ঠিত সিরিজ নিয়ে কজন লেখক এমন সাহস করতে পারেন, তা ভাবনার বিষয়।

গত কয়েক বছরে যোগাযোগ অনেকটাই কমে গিয়েছিল আমাদের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কম্পিউটারের সামনে বসে লিখতে পারতেন না আর। শেষবার যখন কথা হয়েছিল, এটা নিয়ে বেশ হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। লেখালেখি যাঁর জীবন, তিনি যদি লিখতেই না পারেন, কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক।

অবশেষে গত ১৫ অক্টোবর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অন্য ভুবনে পাড়ি জমিয়েছেন রকিব হাসান। আমার মতো হাজারো পাঠকের স্বপ্নের কারিগর বিদায় নিয়েছেন চিরদিনের মতো। তাঁর কলমে আর কোনো দিন তিন গোয়েন্দা নতুন কোনো রহস্য সমাধান করবে না, টারজান বেরোবে না কোনো অভিযানে কিংবা আমাদের পড়া হবে না বিখ্যাত কোনো ক্ল্যাসিক কাহিনির অনুবাদ। জীবদ্দশায় যথাযোগ্য সম্মান পাননি তিনি—আমাদের দেশের মূলধারার সাহিত্যবোদ্ধাদের চোখে অনুবাদক বা অ্যাডাপ্টেশনকারীরা চিরকালই অবহেলিত। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য, অন্তত তিন-তিনটি প্রজন্মের বাঙালিদের পাঠক বানিয়েছেন তিনি, বদলে দিয়েছেন তাদের জীবন, খুলে দিয়েছেন তাদের কল্পনার জগৎ। এমন লাখো-কোটি পাঠকের মনে বহুকাল অমর হয়ে রইবেন তিনি। তাঁর মুখেও একই ধরনের প্রশস্তির বাণী শুনেছি। আমাকে বলেছিলেন, প্রথাগত পুরস্কার বা সম্মান নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি; এ দেশের পাঠকেরা তাঁকে যে ভালোবাসা দিয়েছে, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। মহান একজন মানুষের মহান বাণীই বটে।

বিদায়, রকিব হাসান। আপনাকে আমরা কোনো দিন ভুলব না।

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**

● শব্দের খেলা

শব্দভেদ

শব্দভেদ মেলানোর নিয়ম সহজ। বাঁ থেকে ডানে এবং ওপর থেকে নিচে দেওয়া থাকে সংখ্যা। সংখ্যা অনুযায়ী দেওয়া থাকে সংকেত। সে অনুযায়ী শব্দ খুঁজে ফাঁকা ঘরে বসালেই শব্দভেদ। তোমাদের জন্য শব্দভেদ বানিয়েছেন **সুমন মাহমুদ**

১	২		■	৩		■	৪
■		■	৫		■	৬	
৭	■	৮	■	৯	১০	■	
১১				■		■	
	■		■	১২	■	১৩	
■	১৪	■	১৫		১৬		■
১৭		১৮		■		■	১৯
	■		■	২০			

বাঁ থেকে ডানে

১. বাল্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সী। ৩. জ্যোতি, কিরণ। ৫. রুগ্‌ণ, দুর্বল। ৬. রং, অক্ষর। ৯. থেমে যাওয়া। ১১. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা। ১৩. অবস্থা, দশা। ১৫. অতিশয় মত্ততা, দাপাদাপি। ১৭. অতীত কথা, প্রাচীন কাহিনি। ২০. ঠুকলে আগুন জ্বলে এমন পাথর।

ওপর থেকে নিচে

২. ঔজ্জ্বল্য, কান্তি। ৩. ইংরেজ গোয়েন্দা ঔপন্যাসিকের নাম। ৪. সোনার পদ্মফুল, রক্তপদ্ম। ৭. সংবাদ, বার্তা। ৮. 'অয়ন-জিমি' সিরিজের চরিত্র। ১০. জাপানি কমিকস বা গ্রাফিক উপন্যাস। ১২. বাসব রায়ের কমিকস। ১৩. হস্তী। ১৪. প্রদীপ, বর্তিকা। ১৫. ৩০ দিন। ১৬. মূল্যবান পাথর বা রত্ন। ১৭. আদনান মুকিতের ধারাবাহিক কমিকসের চরিত্র। ১৮. অস্থি, মর্ম। ১৯. হকিস্টিক দিয়ে যা খেলা হয়।

গত সংখ্যার সমাধান

প্র	তি	ষ্ঠা	বা	র্ষি	কী	■	প
■	মি	■	য়ু	■	ট	গ	র
চা	■	বী	■	সা	প	■	শ
বি	চা	র	ক	■	ত	ন্ত	■
■	বু	■	বি	হ	ঙ্গ	■	হি
শি	ক	ল	■	ল্লা	■	তে	জি
রো	■	ঘু	ম	■	ঘা	■	বি
পা	খা	■	শা	ক	স	ব	জি

অক্টোবর মাসের শব্দভেদ বিজয়ী

আরিয়েভি ইসলাম
তৃতীয় শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

'শব্দভেদ'-এর উত্তর মিলিয়ে পাঠাও editor@kishoralo.com—এই ঠিকানায়। বিজয়ীদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে একজন পাবে প্যাভিলিয়নের পক্ষ থেকে 'শব্দজব্দ' বোর্ডগেম। উত্তর পাঠানোর শেষ সময় ২০ নভেম্বর।

কিশোর আলোর গ্রাহকেরা শব্দজব্দ অর্ডার করলেই পারে
বিশেষ ডিসকাউন্ট
৬ মাসের গ্রাহকদের জন্য প্রোমো কোড : KIA10
১২ মাসের গ্রাহকদের জন্য প্রোমো কোড : KIA15
শব্দজব্দ **অর্ডার করতে ভিজিট করো—**
www.shobdojobdo.com

একজন রকিব হাসান ও সেবা প্রকাশনীর গুগল

মাসুমা মায়মুর

কারও সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে বা লিখতে গেলে সবচেয়ে যেটা জরুরি, সেটা হলো তাঁকে ভালো করে জানা-শোনা, থাকা কিংবা দেখা হওয়া। রকিব হাসান সাহেবের সঙ্গে আমার জীবনে দেখা হয়েছে মোট তিনবার। কিন্তু এই লেখার জন্য আমার অবলম্বন হচ্ছে বাড়িতে মুখে মুখে শোনা তাঁর সম্পর্কে গল্প। যদিও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়াটাই ছিল বেশি মজার। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম আমার ছোট ছেলে রামিনকে কোলে নিয়ে। রামিনের বয়স তখন ৮ কি ৯ মাস। রকিব হাসান সাহেব সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন ওপরের দিকে। চোখে বাদামি রোদচশমা। ওটাই আবার পাওয়ার্ড। আমাকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। চোখ থেকে ধাঁ করে সানগ্লাস খুলে বললেন,

'আরে, কে রে এটা?'

আমিও অবাক তাঁর মুখে এমন কথা শুনে।

আমাকে কনফিউশন থেকে মুক্ত করে দিয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন তিনি, 'আমারে এক্কেরে চমকায়া দিছো, বউমা...আকাশ থেইকা পড়লাম জানি! এমনও হয়?'

আমি ওঁর কথা বুঝতে না পেরে হাঁ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

'বুঝলা না, তা-ই তো?...তোমার কোলেরটার কথা কই...এইডা রিংকুর (কাজী মায়মুর হোসেন) পোলা শিওর...কী কারবার...আমি ফির‍্যা গেছি সেই ১৯৭৭ সালে, যখন সেবা প্রকাশনীতে প্রথম আইছিলাম... এক চেহারা...এক বয়স...সমীরণের মায়ের (রিংকুর

রকিব হাসান।
ছবি : কবির হোসেন

আয়া) কোলে সারা দিন ঘুরতাছে আর বিস্কুটের টিন থাপড়াইতাছে...পোলা দেহি বাপের পুরো ফটোকপি...' বলে আবারও একগাল হাসলেন তিনি। কোলে নিয়ে একটু আদর করে চলে গেলেন অফিসে। ২০১১ সালের কথা সেটা।

কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল একেবারে আপন ভাইয়ের মতো। আব্বা তাঁকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। একসঙ্গে লেখালেখি, আড্ডা ছিল তাঁদের নিয়মিত রুটিন। সেবা প্রকাশনীতে তাঁর আগমনটা ছিল আকস্মিক এক ঘটনা।

১৯৭৫ সালের কথা। তুঙ্গে তখন 'মাসুদ রানা'র জনপ্রিয়তা। দুই হাতে লিখে চলেছেন গোস্টরাইটাররা। কিন্তু যেহেতু বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে 'মাসুদ রানা' লেখা হতো, তাই 'মাসুদ রানা'র বাজার ধরে রাখার জন্য গোস্টরাইটারসহ সবাই সেই ইংরেজি বইগুলোর সন্ধানে থাকতেন—যেটা দিয়ে লেখা যাবে নতুন 'মাসুদ রানা'। ইংরেজি বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারা ছিল সেবা প্রকাশনীর লেখকদের নিয়মিত রুটিন। একটা ভালো বইয়ের সন্ধানদাতার জন্যও ছিল নির্দিষ্ট সম্মানী।

এভাবেই সেগুনবাগিচার কয়েকটি ইংরেজি বইয়ের দোকানের একটিতে বইয়ের সন্ধান করতে গিয়ে শেখ আবদুল হাকিম সাহেব দেখা পান রকিব হাসান সাহেবের।

একহারা, ফরসা ধবধবে ২৩ বছরের তরুণ। সদ্য পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চাকরি ছেড়ে রুটিরুজির সন্ধানে নতুন একটা চাকরিতে জয়েন করেছেন তিনি। পুলিশের চাকরিতে মা-বোন তুলে ট্রেইনিংয়ের সময় কনস্টেবলদের গালাগাল মন ভেঙে দিয়েছিল তাঁর। উনি ঠিক করেছিলেন, এই চাকরি কোনোভাবেই করবেন না। এদিকে চারপাশে শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দামামা।

বাড়িতে ফিরে এসে আর কখনো পুলিশের সেই চাকরিতে জয়েন করেননি। চাকরি নেন ঘোড়াশালের বিশাল এক জুট মিলে, অফিশিয়াল কাজ। প্রচুর

রকিব হাসানের সঙ্গে লেখক, ছবি : লেখকের ফেসবুক থেকে নেওয়া

ইংরেজি বই পড়েন অবসরে। সেই বইয়ের সন্ধানেই তিনি এসেছিলেন বইয়ের দোকানে। সেখানেই যখন জানলেন, শেখ আবদুল হাকিম সাহেব সেবা প্রকাশনীর, খেদ ঝাড়লেন মনের সুখে। 'আপনারা কিন্তু আমার মতো বইপড়ুয়াদের সর্বনাশ করে দিচ্ছেন এই বিদেশি কাহিনি অবলম্বন করে বাংলায় বই লিখে।'

রীতিমতো অপ্রস্তুত হলেন শেখ আবদুল হাকিম সাহেব। বললেন, 'আমরা আবার কী করলাম?'

'সেবা প্রকাশনীর বই পড়ি আমি। কিন্তু যে ইংরেজি বই-ই পড়তে যাই, দেখি ওটা আমি আগেই পড়ে ফেলেছি,' অভিযোগের সুরে বললেন তরুণ।

শেখ আবদুল হাকিম সাহেব তো এবার অবাক। বলে কী এই তরুণ! কত বই পড়ে সে?

'কী বলেন, তা-ই নাকি? এত ইংরেজি বই পড়েন আপনি?'

এরপর শেখ আবদুল হাকিম সাহেব জানলেন যে শত শত ইংরেজি বই পড়ে ফেলেছে এই তরুণ। একদিন তিনি কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার দাওয়াত দিয়ে বসলেন তরুণ ছেলেটাকে। রকিব হাসান সাহেব দ্বিধায় পড়ে গেলেন। কিছুটা ভয় নিয়ে ভাবলেন, এটা আবার কোনো ফাঁদ নয় তো! আমি তো আবার এদের গালমন্দ করলাম।

সেদিন বিদায় নিলেন প্রখ্যাত লেখক শেখ আবদুল হাকিম আর হবু লেখক রকিব হাসান। কয়েক দিন পর মনে দ্বিধা নিয়ে সেগুনবাগিচা প্রেসে এলেন তিনি। টিনের বড় অফিস। পরে দেখেছেন ভেতরের দিকে চারকোনা একটা ঘরে কাটিং মেশিন। সামনে চওড়া এক দরজা পেরোলে আমেরিকান বহু পুরোনো একটি ট্রেডল মেশিন। বাঁয়ে কম্পোজ সেকশন।

যা-ই হোক, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হওয়ার পর রকিব সাহেবকে দেখিয়ে দেওয়া হলো ছোট্ট টিনের ঘরটা। ম্যানেজার নিজেই তাঁকে পৌঁছে দিলেন ওখানে। সত্যি সত্যি কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের সাক্ষাৎ পেয়ে অবাক হলেন রকিব হাসান। টেবিলের এদিকে দুই চেয়ার, আর টেবিলের ওদিকে গম্ভীর চেহারায় বসে আছেন সেবা প্রকাশনীর কর্ণধার।

একটু আগে বা পরে হাজির হয়ে গেছেন শেখ আবদুল হাকিম। তিনজনের আলাপ শুরু হলে কিছুক্ষণের ভেতর কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেব বুঝে গেলেন—এই তরুণ যা বলেছে, তা আসলেই সত্যি। রাত-দিন বইয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে ছেলেটা।

কথায় কথায় তরুণ জানালেন যে তাঁর কাছে অনেক ইংরেজি বই আছে, যেগুলো দিয়ে সেবা প্রকাশনীর 'মাসুদ রানা' হতে পারে।

এভাবেই শুরু হলো সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে রকিব হাসান সাহেবের সম্পর্ক। উনি বই বাছাই করে দিতে শুরু করলেন 'মাসুদ রানা' ও অন্যান্য সিরিজের জন্য। তারপর একসময় নিজেই শুরু করলেন লেখালেখি।

প্রথম লেখা বই কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেব দেখে দিয়ে বললেন, 'আপনি যা লিখে এনেছেন, তা তো ইংরেজির আড়ষ্ট অনুবাদ। আপনি বরং আপনার নিজের ভাষায় বইটি লিখে আনুন।'

বই জমা দেওয়া শেষে মেরামত হওয়ার পর ওটা থেকে এল ১ হাজার ৭০০ টাকার বেশি, যা জুট মিলে রকিব সাহেবের বেতনের কয়েক গুণ বেশি। এতে নড়েচড়ে

বসলেন তাঁর অফিসের কলিগরা। কেউ বললেন, 'ভাই, এই চাকরি আপনার জন্য না...আপনি লেখালেখিতে মন দিন...ওখানেই আপনার হাত খুলবে।'

আবার সিনিয়র কলিগদের কেউ কেউ বললেন, 'তুমি যা পেয়েছ, সেটা তো তোমার বেতনের চেয়ে অনেক বেশি। তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?'

কিন্তু তাঁর মনে বারবার এল নানান ধরনের দ্বিধা। পরে যদি আর সেবা প্রকাশনীতে লিখতে না পারি? তবু সাতপাঁচ ভেবে অবশেষে চাকরি ছেড়ে দিলেন তিনি। আবুল কাশেম মোহাম্মদ আবদুর রকিব সাহেবের বুক নেম 'রকিব হাসান' দিয়েছিলেন *বিচিত্রা*র সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী। শুরু করলেন রকিব হাসান নামে একের পর এক লেখা। শুধু নিজেই লিখলেন, তা-ই নয়...রাত-দিন বইয়ের নেশায় থাকতেন বলে রকিব হাসান সাহেব অন্য লেখকদেরও বাছাই করে দিতেন নানান ধরনের বই। সেই সময় সেবা প্রকাশনীর লেখকেরা সবাই যেন ছিলেন একটা বড় পরিবার। এভাবেই চলতে লাগল রকিব হাসান সাহেবের লেখালেখি। কখনো তাঁর লেখা বই মেরামত করেন কাজী আনোয়ার হোসেন আবার কখনো করেন স্বনামধন্য কবি সাযযাদ কাদির সাহেব।

একসময় তিনবারের চেষ্টায় রকিব হাসান সাহেবের হাত দিয়ে যে বইটি এল আর যে ভাষারীতি দাঁড়াল, সেটা দিয়েই উনি মুগ্ধ করে গেছেন সেবা প্রকাশনীর পাঠকদের সারা জীবন। '৮৪ সালের দিকে রকিব হাসান সাহেবের হাতে এসেছিল 'থ্রি ইনভেস্টিগেটর' সিরিজ। বইগুলো পড়ে উনি এলেন কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে। '"মাসুদ রানা" তো বড়দের সিরিজ... বাচ্চাদের জন্য একটা সিরিজ করলে কেমন হয়?'

এবার সবাই মিলে চলল নতুন সেই সিরিজ নিয়ে আলোচনা। কিশোর, রবিন, মুসাসহ সব নাম ঠিক করা হলো। শুরু হলো 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজের শুভসূচনা। ওদিকে সবাইকে বই বাছাই করে দেওয়ার কাজটা নিজের উদ্যোগেই করে গেলেন রকিব হাসান সাহেব।

কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেব ও তাঁর দুই পুত্র সারা জীবন স্বীকার করে গেছেন যে সেদিন শেখ আবদুল হাকিম সাহেবের সঙ্গে যদি রকিব হাসান সাহেবের দেখা না হতো, আর রকিব হাসান সাহেব সেবা প্রকাশনীর জন্য এত বই বাছাই না করে দিতেন, তা হলে সেবা প্রকাশনীর অনুবাদের ভান্ডার এত সমৃদ্ধ হওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠত। এখন ইন্টারনেটের যুগ, চাইলেই অনেক কিছু হাতের নাগালে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই আমলে এমন একজন বইপড়ুয়া মানুষই যেন ছিল সেবা প্রকাশনীর জন্য আস্ত এক বিশাল গুগল। উনি ছিলেন সেবা প্রকাশনীর বড় একটা অংশ। কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের সঙ্গে ছিল তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক। কাজী মায়মুর হোসেন সাহেবের কাছেও শুনেছি, একসঙ্গে পাখি শিকারে যেতেন কাজী আনোয়ার হোসেন, রকিব হাসান, হুমায়ুন খান ও তিনি। শিকারে শীতকালে গেলে রকিব হাসান সাহেবের স্ত্রীর হাতের মোরগভুনা আর ছিটা রুটি ছিল সবার কাছে সত্যিকারের অমৃতের মতো কিছু। মায়মুর সাহেবের ভীষণ প্রিয় ছিল তাঁর স্ত্রীর হাতের রান্না। তাঁর স্ত্রী এটা জানতে পেরে নিজের হাতের মায়াভরা সেই রান্না মস্ত এক টিফিন ক্যারিয়ারে করে পাঠিয়েছিলেন মায়মুর সাহেবের জন্য। রকিব হাসান সাহেব সেই টিফিন ক্যারিয়ার নিজের হাতে অফিসে এনে বলেছিলেন, 'লও, এইটা তোমার চাচি

এবার সবাই মিলে চলল নতুন সেই সিরিজ নিয়ে আলোচনা। কিশোর, রবিন, মুসাসহ সব নাম ঠিক করা হলো। শুরু হলো 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজের শুভসূচনা। ওদিকে সবাইকে বই বাছাই করে দেওয়ার কাজটা নিজের উদ্যোগেই করে গেলেন রকিব হাসান সাহেব।

তোমার জন্যে পাঠাইছে।'

এত আন্তরিক সম্পর্ক, এই প্রতিভাকে ধ্বংস করার জন্য একসময় এসেছিল স্বার্থান্বেষী একদল মানুষ, যারা চেয়েছিল তাঁর এই প্রতিভাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে। প্রতিনিয়ত রকিব হাসান সাহেবকে ভুল বুঝিয়ে সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে সম্পর্কটা নষ্ট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল তারা। শুরুতে রকিব হাসান সাহেব বুঝতে না পারলেও একসময় বুঝতে পারেন। কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের কাছে খুলে বলেন সব। কিন্তু পরিস্থিতি তখন এমনই ছিল যে উনি চাইলেও সেই নোংরা রাজনীতির খেলা থেকে আর এই জীবনে বের হতে পারেননি পুরোপুরি।

আসলে সব তো প্রকাশ্যে খুলে বলা যায় না। কিন্তু উনি অসুস্থ হলে আমি যখন তাঁর জন্য আর্থিক সহযোগিতার পোস্ট দিই, তখন অনেকেই আমার কাছে জানতে চান যে তাঁর সারা জীবনের লেখালেখির আয় আসলে কোথায় গেল। আর্থিক অবস্থা এমনটা হলো কেন। আমি তাঁদের বলতে পারিনি যে যারা তাঁকে নিয়ে নোংরা খেলা খেলেছিল, তারাই আসলে দায়ী এই অবস্থার জন্য। সব বলা যায় না, কিন্তু কিছু তো একটা ছিলই। আমি আমার জায়গা থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি তাঁর পাশে থাকার জন্য। কতটুকু করতে পেরেছি জানি না, কিন্তু চেষ্টার কমতি ছিল না আমার। কমতি ছিল না আমার প্রতি তাঁর সন্তুষ্টিরও। চলে যাওয়ার আগে আমার মাথায় হাত রেখে উনি দোয়া করে গেছেন।

সেটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট পাওয়া।

চোখের সামনে সেই চেহারাটা আমার এখনো ভাসে, সেই সরল হাসি, 'আমারে এক্কেরে চমকায়া দিছো, বউমা... আমি তো ফিরা গেলাম সেই '৭৭ সালে...'

পরপারে উনি ভালো থাকুন সেই কামনা করি অন্তর থেকে। একটা সমুদ্র হতে চাওয়া মানুষকে যারা আটকে দিয়েছিল নিজেদের স্বার্থের বাঁধে, এলোমেলো করে দিয়েছিল ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে লেখালেখির জগৎ, আটকে দিয়েছিল তাঁর বিকাশের প্রশস্ত পথ, সে রকম কোনো স্বার্থান্বেষী মহল তাঁকে আর স্পর্শ করবে না কখনোই।

মাসুমা মায়মুর
উপদেষ্টা, সেবা প্রকাশনী

জানা-অজানা রকিব হাসান

অনীশ দাস অপু

১৯৮৫ সালে রকিব হাসান যখন কিশোরদের জন্য 'তিন গোয়েন্দা' লিখতে শুরু করেন, তখন আমি কিশোর নই, কলেজে পড়ি। তবে রকিব হাসানের লেখা সব বই তত দিনে পড়ে ফেলেছি এবং তাঁর ভক্ত হয়ে গেছি। বিশেষ করে তাঁর *ড্রাকুলা*র অনুবাদ এবং শিকারকাহিনিগুলো আমার দারুণ লাগত। স্কুলজীবনে বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে তাঁর *ড্রাকুলা* পড়ে এতটাই ভয় পেয়েছিলাম, রাতে একা একা বাসায় ফিরতে ভীষণ ভয় লাগছিল। অনেকেই পরবর্তী সময়ে *ড্রাকুলা* অনুবাদ করেছেন; কিন্তু রকিব হাসানের অনুবাদের ধারেকাছে পৌঁছার ক্ষমতা কারও ছিল না। রকিব হাসানের *তিমির প্রেম* বইটিও আমাকে দারুণ টেনেছে। আর তাঁর অনূদিত *টম সয়্যার* পড়ে এতটাই মুগ্ধ হই, আমারও মনে ইচ্ছা জাগে ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করব। আমার প্রয়াত মেজ ভাই ছিল সেবা প্রকাশনীর বইয়ের বিরাট ভক্ত। মূলত সে-ই সেবার নতুন নতুন বই ভাড়া করে আনত এবং আমি সেই সুযোগে বইগুলো পড়ে ফেলতাম। স্কুল ও কলেজজীবনে থাকতেই সেবা প্রকাশনীর সব বই আমার পড়া সারা। 'কুয়াশা', 'মাসুদ রানা', রহস্য উপন্যাস, কিশোর ক্ল্যাসিক, ওয়েস্টার্ন, শিকারকাহিনি, জুলভার্ন এবং অবশ্যই 'তিন গোয়েন্দা' ও 'টারজান' সিরিজের বই। সেবার লেখকদের মানুষ মনে হতো না, মনে হতো দেবতা! ইচ্ছা জাগত তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করব। তাঁরা তাঁদের লেখনী দিয়ে এতটাই মুগ্ধ করে রেখেছিলেন আমাকে! অবশ্য তখন সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না একদিন আমি নিজেই সেবার লেখক হয়ে যাব এবং পূজনীয় লেখকদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য হবে।

রকিব হাসানের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৯১ সালের শরতের এক ঝলমলে বিকেলে। সেদিন ছিল শনিবার। আমি দুটো লেখা নিয়ে গিয়েছিলাম শেখ আবদুল হাকিম ও নিয়াজ মোর্শেদের জন্য। একটি গল্প, অপরটি ফিচার। রকিব হাসানের পাশাপাশি এই দুই লেখকের প্রতিও আমার ছিল পরম শ্রদ্ধা। হাকিম ভাইয়ের *কামিনী* এবং *গডফাদার*-এর অনুবাদ পড়ে আমি তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত। আর নিয়াজ ভাইয়ের ক্ল্যাসিক অনুবাদগুলো তো ছিল অনবদ্য। *রহস্য পত্রিকা*র গল্প-উপন্যাস বিভাগের দায়িত্ব ছিল হাকিম ভাইয়ের। নিয়াজ ভাই এবং রকিব ভাই মিলে ফিচার বিভাগ সামলাতেন। আমি রকিব ভাইয়ের জন্য ওই সময় কোনো লেখা নিয়ে যাইনি, বাড়তি কোনো ফিচার অনুবাদ করা ছিল না বলে।

তিন সুপারস্টার লেখকের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন *রহস্য পত্রিকা*র সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন ভাই। রোগা, শ্যামলা হাকিম ভাই আমার লেখা গল্পটির এক পাতা পড়ে মন্তব্য করলেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই। রেখে যান। তিন মাস পরে খোঁজ নিয়েন লেখাটা ছাপা হলো কি না।' স্বল্পভাষী নিয়াজ ভাই শুধু মাথা বাঁকালেন, যার অর্থ হতে পারে—রেখে যাও। পরে দেখব। তবে যাঁর সঙ্গে আমার কথা বলার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা হচ্ছিল, আমার কিশোরবেলার হিরো, সেই রকিব হাসান আমাকে পাত্তাই দিলেন না। আমার আদাবের জবাবে সামান্য মাথা দুলিয়ে লেখা সম্পাদনার কাজে ফিরে গেলেন। আমি তাঁর সামনে চুপচাপ বসে রইলাম। তিনি লেখাটি পড়া শেষ করলেন এবং 'কিচ্ছু হয় নাই' বলে ওটা ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর পাশে বসা হাকিম ভাইয়ের সঙ্গে গপ্পো জুড়ে দিলেন।

টকটকে ফরসা গায়ের রঙের রকিব হাসান উচ্চ স্বরে কথা বলতেন। অন্যরা তাঁর কথা শুনছে কি না, সেদিকে খেয়ালও করতেন না। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে প্রথম দর্শনেই তাঁকে আমার অপছন্দ হয়ে গেল। মনে হলো অত্যন্ত অহংকারী একজন মানুষ, যিনি নিজের মতামতকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তখন অবশ্য কল্পনাতেও ছিল না এই মানুষটি একদিন হয়ে উঠবেন আমার বন্ধুর মতো এবং আমরা একসঙ্গে চলব অনেকটা পথ।

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে রকিব হাসান জনপ্রিয়তার স্বাদ পেতে শুরু করেন। নব্বইয়ের দশকে সেই জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়ে যায়। তাঁর 'তিন গোয়েন্দা' প্রতি মাসে সাত হাজার কপি ছাপা হতো। কোনো কোনো বইয়ের এডিশন তিন দিনেও শেষ হয়ে গেছে। কাজী আনোয়ার হোসেনের 'মাসুদ রানা'র পর তাঁর বই-ই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হতো সেবা প্রকাশনীতে। তবে রকিব ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি, 'তিন গোয়েন্দা'র চেয়েও তাঁর সবচেয়ে বেশি বিক্রীত বই ছিল *ড্রাকুলা*। 'মাসুদ রানা' সিরিজের *ধ্বংসপাহাড়*-এর পর *ড্রাকুলা* ছিল সেবা প্রকাশনীর সর্বাধিক এডিশনের বই। নব্বই দশকের শুরুতে তিনি ত্রৈমাসিক রয়্যালটি পেতেন নব্বই হাজার টাকার বেশি। দুই হাতে লিখতেন। সঙ্গী ছিল টাইপরাইটার। পরে কম্পিউটার। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'সারা জীবন টাইপরাইটার আর কম্পিউটারে লিখতে লিখতে হাতে লিখতে ভুলেই গেছি। এমনকি ব্যাংকের চেক বইতে সই করতে গেলেও আঁকাবাঁকা হয়ে যায় সই।'

রকিব ভাই ছোট-বড় মিলিয়ে মাসে ছয়টি বই লিখেছেন এমন রেকর্ডও আছে। আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এত লেখার স্ট্যামিনা কোথায় পান?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'এ জগতে টিকে থাকতে হলে নিয়মিত লিখতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। লেখায় ছাড় দিয়েছেন কি আপনি শেষ। একবার বিরতিতে গেলে আর কোনো দিনই আগের মতো করে ফিরে আসতে পারবেন না।'

*রহস্য পত্রিকা*র অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন রকিব হাসান। তাঁর এবং হাকিম ভাইয়ের কাছ থেকে লেখা সম্পাদনার অনেক কিছুই শিখেছি। রকিব ভাই শুরুতে আমাকে কোনো কাজ দেননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ। লেখা দিয়ে তাঁর মন জয় করা খুবই কঠিন ছিল। তিনি আমাকে লেখা অনুবাদ করতে দেওয়ার আগে হাকিম ভাই ও নিয়াজ ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন, আমার ওপরে ভরসা করা চলে কি না। সবুজসংকেত পাওয়ার পর আমাকে *রিডার্স ডাইজেস্ট* পত্রিকা থেকে একটি ফিচার অনুবাদ করতে দিয়েছিলেন। পরে আমার ওই লেখা দিয়েই তিনি সেবারের *রহস্য পত্রিকা*র কভার তৈরি করান। এরপরে আমাকে দিয়ে অসংখ্য লেখা লিখিয়েছেন রকিব ভাই। ধারাবাহিকভাবে দুটো বইও অনুবাদ করিয়েছিলেন। একটি ছিল জিম করবেটের *বনের গল্প*, অপরটি জেরাল্ড ডুরেলের *মানবজন্তু*। যে রকিব ভাই একদা আমাকে তেমন পাত্তা দেননি, একসময় সেই আমি হয়ে উঠেছিলাম তাঁর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুবাদক। *রহস্য পত্রিকা*র সিংহভাগ ফিচার আমাকে দিয়ে অনুবাদ করাতেন তিনি। আমি তখন অর্ক দাসগুপ্ত, আনন্দ সিদ্ধার্থসহ অসংখ্য ছদ্মনাম ব্যবহার করতাম। কোনো কোনো সংখ্যায় ১৩-১৪টি লেখাও ছাপা হয়েছে আমার। একবার রকিব ভাই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'এবারের *রহস্য পত্রিকা*য় লিখে অনীশ আমাদের বেতনের চেয়েও বেশি বিল নিয়ে

গেল!' সেই সময় *রহস্য পত্রিকার* সহকারী সম্পাদকদের বেতন ছিল ২৭৫০ টাকা। তাঁরা সপ্তাহে তিন দিন অফিস করতেন। বিকেলে। তুমুল আড্ডা হতো। বেশির ভাগ সময় কথা বলতেন রকিব ভাই। আড্ডা জমিয়ে তুলতে পারতেন অবলীলায়। সবচেয়ে কম কথা বলতেন নিয়াজ মোর্শেদ। আপনমনে নিজের কাজ করে যেতেন। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি, আমি তাঁকে কোনো দিন হাসতে দেখিনি। এমন নয় যে তিনি ছিলেন গোমড়ামুখো। তবে খুব গম্ভীর থাকতেন। তরল স্বভাবের ছিলেন হাকিম ভাই। তবে আড্ডার মধ্যমণি হিসেবে সব সময়ই দেখেছি রকিব হাসানকে। ঘর ফাটিয়ে ঠা ঠা করে হাসতেন। একবার কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই বাসযাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, 'ঢাকা থেকে কক্সবাজার-যাত্রার এই ভ্রমণকাহিনি নিয়েই দুটো "তিন গোয়েন্দা" লিখে ফেলা যায়।' লিখেওছিলেন।

রকিব ভাই সম্পর্কে অনেকেই হয়তো জানেন না তিনি গোস্টরাইটার হিসেবে প্রচুর বই লিখেছেন। সেবা থেকে তাঁর প্রথম বই *ড্রাকুলা* বের হলেও তিনি শুরু করেছিলেন 'মাসুদ রানা' সিরিজের *কুউউ!* দিয়ে। কাজীদাকে আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, রকিব ভাইয়ের লেখা তাঁর কেমন লাগে। তিনি বলেছিলেন, 'ও তো পুরোটাই আমার হাতে গড়া লেখক। শুরুতে রকিব অনেক ভুলভাল লিখত। দুই ভাইকে লিখত "দোনো ভাই"। আঞ্চলিকতার একটা ছাপ চলে আসত ওর লেখার মধ্যে। আমি ওকে বলতাম, "আপনি তো গল্প বলেন চমৎকার। এ রকম সাবলীলভাবে গল্প বলার ঢঙে লিখলেই হয়।" ও পেরেছে, তাই সেবার সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হয়েছে। আসলে ন্যাক থাকা চাই। নইলে শত ধাক্কাধাক্কিতেও লাভ হবে না।'

কাজীদাকে রকিব হাসান গুরু মানতেন। তিনি কাজীদার 'মাসুদ রানা' সিরিজের বেশ কয়েকটি বই লিখে দিয়েছিলেন ছায়ালেখক হিসেবে। *কুউউ!* ছাড়াও *লেনিনগ্রাদ*, *বুশ পাইলট*, *অমানুষ* ইত্যাদি তাঁর লেখা। (আমি তাঁকে জেমস হেডলি চেজের অনেকগুলো বই দিয়েছিলাম রহস্য উপন্যাস লেখার জন্য। তত দিনে তিনি সেবা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাবাজারে লেখার চেষ্টা করছেন) সেবা থেকে প্রকাশিত আমার অত্যন্ত প্রিয় রহস্য উপন্যাস *দাঁড়াও, পথিক* কাজীদার নামে বের হলেও ওটার মূল লেখক রকিব হাসান। আমি একদিন বইটির খুব প্রশংসা করছিলাম দেখে তিনি মিটিমিটি হাসছিলেন। তারপর বললেন, 'ওটা আমার লেখা বই। জেমস হেডলি চেজের *কাম ইজি, গো ইজি* অবলম্বনে লেখা।'

রকিব হাসান কোনো এক অভিমানে সেবা প্রকাশনী ছেড়ে চলে যান সম্ভবত ২০০৩ বা ২০০৪-এ। তারপর তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগটা ছিল মূলত টেলিফোনে। মাঝেমধ্যে জরুরি প্রয়োজনে আমার সঙ্গে দেখাও করতেন। ২০০৭ সালে আমি *সিলেটবাজার* নামে একটি পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলাম। অফিসটা ছিল নয়াপল্টনে। ওখানে আসতেন রকিব ভাই। রকিব ভাইয়ের মতো লেখক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দেখে আমার কলিগরা থ হয়ে যেত।

রকিব ভাই বাংলাবাজারে লেখার তোড়জোড় করছিলেন। প্রায়ই আমাকে ফোন করতেন বাংলাবাজারের প্রকাশকদের হালহকিকত জানার জন্য। ওখানকার প্রকাশকেরা সেবা প্রকাশনীর মতো নিয়মিত রয়্যালটি দেন না শুনে তিনি বেশ হতাশই হয়েছিলেন। তাঁকে পরামর্শ দিই এককালীন পেমেন্ট নিতে, যেটা আমি একদম শুরু থেকে করে আসছি। তাতে ঠকার চান্স থাকে কম। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তা-ই করবেন।

সেবা থেকে চলে আসার পর রকিব হাসানের মতো জনপ্রিয় লেখকেরও নতুন পরিবেশে চলার পথটি খুব একটা মসৃণ ছিল না। আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর হতাশা, রাগ, ক্ষোভ সব লক্ষ করেছি। তবে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। অহংকারী মানুষ ছিলেন। তবে আত্মবিশ্বাসেরও কোনো ঘাটতি ছিল না। তিনি বলতেন, 'এই খারাপ সময়টা আমি ঠিকই কাটিয়ে উঠব।' তা তিনি পেরেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে স্বমহিমায় আবার আবির্ভাব ঘটে রকিব হাসানের। নতুন পাণ্ডুলিপির জন্য বাংলাবাজারের প্রকাশকেরা লাইন দিয়ে যেতে শুরু করেন তাঁর বাসাবোর বাসায়। তাঁর 'তিন গোয়েন্দা' নিয়ে টিভিতে সিরিয়ালও হয়েছে। তবে সেই নাটক দেখে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন রকিব ভাই। বলেছিলেন, 'আমার "তিন গোয়েন্দা"কে ওরা শেষ করে দিয়েছে। আর কোনো দিন কাউকে "তিন গোয়েন্দা" দিয়ে টিভি নাটক বানানোর অনুমতি দেব না।'

রকিব হাসান তাঁর জীবদ্দশায় লেখক হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। অর্থ-যশ-খ্যাতি লাভ করেছেন কাজী আনোয়ার হোসেন ও হুমায়ূন আহমেদের মতোই।

রকিব হাসান তাঁর জীবদ্দশায় লেখক হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। অর্থ-যশ-খ্যাতি লাভ করেছেন কাজী আনোয়ার হোসেন ও হুমায়ূন আহমেদের মতোই। কিন্তু প্রচণ্ড অসুস্থতায় আর যখন লিখতে পারছিলেন না, তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল হাহাকার, 'আমি আর লিখতে পারছি না, অনীশ। সারাক্ষণ আমার হাত কাঁপে। কি-বোর্ডে আঙুল স্থির থাকে না। অথচ এখনো কত লেখা বাকি রয়ে গেছে। আরও কত কিছু দেওয়ার ছিল আমার পাঠকদের!'

২০২২ বা ২০২৩ সালের দিকে টেলিফোনে রকিব ভাইয়ের সেই আকুতি আমি যেন এখনো শুনতে পাই। আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি। ওনাকে কয়েকবার ফোন করেছিলাম। উনি ধরেননি। অথবা ধরতে পারেননি। দুটো কিডনিই বিকল হয়ে গিয়েছিল তাঁর। স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়ে যাচ্ছিল। নিজের স্মৃতিশক্তি নিয়ে গর্ব করতেন রকিব ভাই। বলতেন, কোনো কিছুই ভোলেন না তিনি। নানা আইডিয়া সারাক্ষণ গিজগিজ করত মাথায়। ১৯৮৪ সালে *রহস্য পত্রিকা* নতুন করে চালু করা কিংবা ১৯৮৫ সালে ওয়েস্টার্ন বই বের করার আইডিয়া তাঁরই ছিল। এই মানুষটি এখন আর নেই, তবে 'তিন গোয়েন্দা'সহ অসাধারণ সব বইয়ের লেখক-অনুবাদক হিসেবে পাঠকমনে চিরজাগরূক হয়ে রইবেন রকিব হাসান!

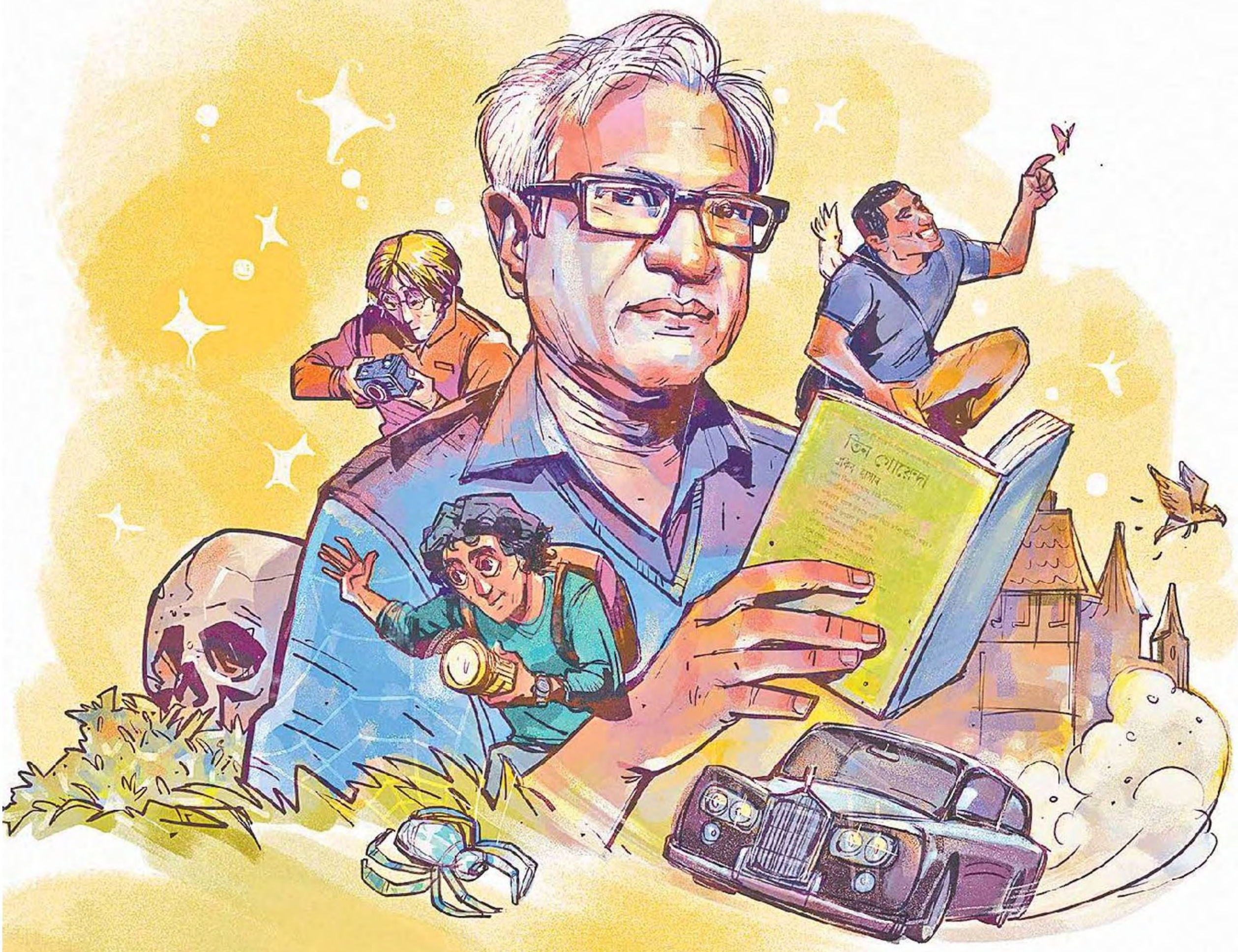

রকিব হাসানের মহাপ্রয়াণ

আবদুল গাফফার রনি

সেদিনটাও ছিল হেমন্তের। বিকেলের সোনালি আলোয় মাঠে বসে আছি। পাহারা দিচ্ছি গমখেত। পশ্চিম মাঠে গম বুনেছেন বাবা। সদ্য বোনা গম পাখিদের বড্ড পছন্দ। গমের বীজগুলো মুখে নিয়ে পালায়। তাই দিতে হয় পাহারা। বসে আছি আলের ওপর। উত্তরের হিমেল বাতাস ইছামতীর বুক ছুঁয়ে আরও শীতল হয়ে গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। রোমকূপে শিহরণ তোলে। তবে সেই শিহরণ আমার কাছে নস্যি। কারণ, অন্য একটা শিহরণ আমাকে পেয়ে বসেছে—তিন গোয়েন্দা। আলের ওপর পড়ছি ভূতের হাসি। সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে রকি বিচের তিন কিশোর দুঃসাহসিক ও গা ছমছমে অভিযানে নেমেছে। আমি তাদের সঙ্গে মনশ্চক্ষু মেলে হইহই করে নেমে পড়েছি রহস্য সমাধানে।

সে এক অন্য রকম অনুভূতি, অন্য রকম আবেগ। এই অনুভূতি আজকালকার স্মার্টফোনে বুঁদ হওয়া ছেলেমেয়েরা কতটুকু বুঝবে, জানি না। পৃথিবী আজ তাদের মুঠোয়। সেকালে সেই অজপাড়াগাঁয়ের এক কিশোর, যে কিনা পত্রিকা আর রেডিওর কল্যাণে পৃথিবীটাকে খুব সামান্য চেনে, তার কাছে ক্যালিফোর্নিয়া, রকি বিচ—তেপান্তরের ওপারের কোনো এক রূপকথার রাজ্যই মনে হবে। তবে যে গল্প লেখক বলছেন, তা মোটেও রূপকথার অলৌকিকতায় মোড়া নয়। আমার গা ছমছম করে বটে, কিন্তু এক দুরন্ত বাঙালি কিশোর অবলীলায় ভূতের হাসির লৌকিক রহস্য সন্ধানে নেমে পড়েছে। এই রহস্যের যিনি রূপকার, যিনি থ্রিলারের সত্যিকারের শিহরণ আমার শিরদাঁড়ায় প্রথম এঁকে দিয়েছিলেন, যিনি সে সময় হয়ে উঠেছিলেন আমার স্বপ্নের নায়ক, ঠিক ২৪ বছর পর আরেক হেমন্তে তাঁর স্মৃতিচারণা করতে হচ্ছে। বড্ড 'মন কেমন করা' এক অনুভূতি চেপে ধরেছে। তবু বুকে পাথর চাপা দিয়ে সেই স্বপ্নের নায়কের কথা না লিখলেই নয়।

গমখেত পাহারা দিয়েছিলাম তিন দিন। 'তিন গোয়েন্দা'র 'ভলিউম ৩/২' ওই তিন দিনে শেষ করে ফেলি।

এর আগেও 'তিন গোয়েন্দা'র আরেকটা বই পড়েছি, *মহাকাশে আগন্তুক*—এটা 'চিলার' সিরিজের বই। তবু ফ্যান্টাসি আর সায়েন্স ফিকশনের মসলায় এখানেও 'তিন গোয়েন্দা' অপূর্ব চমক দিয়েছিল।

২.

সেবার সঙ্গে পরিচয় আমার *রহস্য পত্রিকা*র সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যা দিয়ে। আবিষ্কারের ছয় বছর পর সেটা পড়েছিলাম আর হাট করেই অজপাড়াগাঁয়ে এক আশ্চর্য পৃথিবীর দুয়ার খুলে গিয়েছিল। বিচিত্র সব ফিচার, দুর্দান্ত গল্প আর বিস্ময়কর সব অভিজ্ঞতাভিত্তিক লেখায় ভরা সেই পত্রিকাটি। সঙ্গে পাতায় পাতায় চুম্বকর্ষী সব বিজ্ঞাপন। অন্যগুলোর কথা বাদই দিলাম, শুধু তিন গোয়েন্দার জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনি—কী সব নামের বাহার! পাঠ্যবইয়ের বাইরে কিশোর সাহিত্য আগে তেমন পড়িনি বটে। তবে সবেধন নীলমণি হয়েছিল *পাহাড়ে ফেলুদা* বইটি, যাতে ছয়টি গোয়েন্দা কাহিনি ছিল।

সুতরাং গোয়েন্দা কাহিনি আমার কাছে একেবারে নতুন নয়। এবার 'তিন গোয়েন্দা' পড়ব ভাবলাম, প্রথমেই 'ভলিউম ১/১'-এর জন্য টাকা পাঠাই। কিন্তু ভুল করে '১/১'-এর বদলে '৩/২' পাঠানো হলো। অগত্যা সেটাই পড়ে ফেললাম। অগত্যাই-বা বলি কেন, 'কাকাতুয়া রহস্য', 'ছুটি', 'ভূতের হাসি'—টান টান উত্তেজনার তিন জমাট গল্প। যতটা গল্পের থ্রিল, ঠিক ততটাই পরিবেশে। রকি বিচে ওদের বাস, সেখানে একটা পুরোনো স্যালভিজ ইয়ার্ডের জঞ্জালের নিচে হেডকোয়ার্টার। বেশ কয়েকটা গোপন দরজা আছে সেখানে ঢোকার। কিন্তু সে পথের হদিস তিন গোয়েন্দা ছাড়া আর কেউ জানে না।

জায়গাটা আবার হলিউডের কাছে। টিভি ছিল না বাড়িতে, তাই হলিউডের কোনো মুভি দেখিনি। কিন্তু পত্রিকার কল্যাণে হলিউডের চরিত্রগুলোর অনেকের মুখ চিনি, নাম জানি। সেই হলিউডের এত কাছে থাকে তিন কাছের বন্ধু! হ্যাঁ, বন্ধুই। প্রথম বইটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কখন যে ওরা বন্ধু হয়ে গিয়েছে, টেরই পাইনি। রোমাঞ্চের শুরু সেখান থেকেই, একটা অজপাড়াগাঁয়ের নিঝুম বিকেলে, পড়তি আলোয় পড়া একটা বইয়ের পাতা থেকে সেটার শুরু।

এরপর *রহস্য পত্রিকা* নিয়মিত নিতে শুরু করি। ডাকযোগে। সেবার বইও কিনি, একইভাবে। একটা চিঠিও লিখি *রহস্য পত্রিকায়*। কোনোভাবে যদি রকিবদা, অর্থাৎ রকিব হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়! পাড়াগাঁয়ে তখনো মুঠোফোন আসেনি, ল্যান্ডফোন থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম চিঠি। সেই অভিপ্রায় জানিয়ে *রহস্য পত্রিকা*র খোলাচিঠি পাঠানো হলো। চিঠিটা ছাপা হলো, তার নিচে ছোট্ট করে কাজীদা জবাব দিলেন। বললেন, আমার অভিপ্রায় রকিব হাসানকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিকানাও দিয়েছেন।

ওই পর্যন্তই। রকিবদার চিঠির অপেক্ষায় ছিলাম। কয়েক মাস। কিন্তু পাইনি। বছর দশেক পর তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়।

৩.

আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রিয় লেখককে স্যার বলে। আমরা বলি ভাই, সেবার রীতি ছিল নামের সঙ্গে 'দা' জুড়ে দেওয়ার। যেমন কাজীদা, হাকিমদা ও রকিবদা। এই তিনজন তখন সেবার *রহস্য পত্রিকা*র সম্পাদনার টেবিল সামলাচ্ছেন। কাজীদা আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন। আমাদের সময় সহকারী ছিলেন রকিবদা আর হাকিমদা, অর্থাৎ শেখ আবদুল হাকিম।

রহস্য পত্রিকায় মাঝেমধ্যে আমার লেখা ছাপা হয়। প্রতিটা লেখা ছাপা হওয়ার পর বুকের ছাতিটা যেন এক-দুই ইঞ্চি করে বাড়ে। তখন কাজীদার 'মাসুদ রানা' পড়ছি, হাকিমদার সব মাস্টারপিসও একে একে পড়তে শুরু করেছি। কিন্তু বন্ধুত্বটা সবচেয়ে বেশি কিশোর, মুসা আর রবিনের সঙ্গে।

কখনো তাঁদের সঙ্গে পাড়ি দিচ্ছি আমাজনের ভীষণ অরণ্য, কখনোবা অথই সাগরে তাদের বুদ্ধির ঝিলিকে বিমোহিত হচ্ছি। কঙ্কাল দ্বীপ কিংবা জিনার সেই দ্বীপে চলছে অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার। কখনো কুকুরখেকো ডাইনি, সবুজ ভূত, রুপালি মাকড়সা, কখনোবা দুর্ধর্ষ পোচার, রত্নদানোর মুখোমুখি হয়ে তিন গোয়েন্দার ক্যারিশমায় হাঁপ ছাড়ছি।

যে ছেলেটা এসএসএসির আগপর্যন্ত ১৬ বছরে মাত্র দুটি বই পড়েছে, সেই ছেলেটায় পরের দুই বছরে কয়েক

শ বই পড়ে ফেলে 'সেবা'র কল্যাণে। গ্রাম ছেড়ে একসময় যশোরে আসি, সেখানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে বই নিই নিয়মিত। বিশ্বসাহিত্যের আজব জগতের সুলুক সন্ধান করছি, শার্লক হোমস চলছে, পড়ছি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'অদ্ভুতুড়ে' সিরিজ, তার ফাঁকে ফাঁকে 'তিন গোয়েন্দা' গিলছি গোগ্রাসে। তবে 'তিন গোয়েন্দা'র একনিষ্ঠ ভক্তরা যেভাবে একটা পড়ে পুরো সিরিজ শেষ করে ফেলে, আমি সেভাবে পড়িনি।

কয়েক মাস বিরতি দিয়ে একটা করে ভলিউম পড়ি। তবু রকিব হাসানের লেখা ৬০টি ভলিউম এখনো শেষ করিনি। ইচ্ছা করেই। বয়স বাড়ছে, তবু মাঝেমধ্যে কৈশোরে ফিরে যেতে মন চায়। তখন 'তিন গোয়েন্দা'র না পড়া বইগুলো একটা বের করে পড়ি। এখনো সেই কৈশোরের মতোই বিভোর হয়ে যাই। মনে হয়, কিশোর, মুসা, রবিনের মতো আমার বয়সও থমকে আছে কৈশোরেই।

আমি সব সময় বৈচিত্র্য বজায় রেখে বই পড়ার চেষ্টা করি। আমাদের মাঝেমধ্যে যেমন মিষ্টি খেতে মন চায়, মাঝেমধ্যে পায় ঝালের তেষ্টা, কখনো আবার টকের—আমার বই পড়ার গতিকও তেমন। কখনো কোনো ফিকশন পড়তে ইচ্ছা করে, কখনো নন-ফিকশন। কখনো ওয়ার্ল্ড ক্ল্যাসিক পড়তে মন চায়, কখনো বাংলার চিরায়ত উপন্যাস, কখনো 'তিন গোয়েন্দা', 'মাসুদ রানা', কখনো ঐতিহাসিক কাহিনি, কখনো সায়েন্স ফিকশন। এই বিচিত্র তৃষ্ণার কারণে আজও কিছু 'তিন গোয়েন্দা' রেখে দিয়েছি রসিয়ে রসিয়ে পড়ব বলে। কোথাও ভ্রমণে গেলে 'তিন গোয়েন্দা'র বই রাখি। আকারে ছোট, সহজেই ব্যাগের এককোণে এঁটে যায়। ভ্রমণে আমার সাথি হয় কিশোর-মুসা-রবিন।

৪.

২০১০ সালে ঢাকায় আসি। ২০১২ সালে আমার বন্ধু সুজন ছায়াবীথি নামে একটা প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলেন। তিনি আমাকে একটা পাণ্ডুলিপি দিলেন পড়তে। *বুনো পশ্চিমের গল্প*—বইয়ের নাম। আসলে এক অনবদ্য ওয়েস্টার্ন উপন্যাস। লেখক রকিব হাসান। দুই দিন তাতে বুঁদ হয়ে রইলাম। অসাধারণ কাহিনি। ছায়াবীথি থেকে বইটা বেরোল।

সে বছর বইমেলায় একদিন ছায়াবীথির স্টলের সামনে প্রকাশক বন্ধু পরিচয় করিয়ে দিলেন এক লেখকের সঙ্গে। আমাকে বললেন, 'ওনাকে চেনেন?'

আমি চিনেও যেন চিনতে পারছিলাম না। বন্ধুটি বললেন, ইনিই রকিবদা। রকিবদা নিজেই হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। কথা হলো, আড্ডা হলো। তাঁকে বুঝতে দিলাম না, কিন্তু আমার রোমকূপে তখন শিহরণ বয়ে চলেছে। বছর ১১ আগে যে কিশোর ছেলেটা, অজপাড়াগাঁয়ের গমখেত পাহারা দিতে গিয়ে 'তিন গোয়েন্দা'য় বুঁদ হয়ে থাকত। আজ সেই আমি কিনা সেই লোকটার সঙ্গে আড্ডা মারছি। ওই লোকটা কি বুঝতে পারছে, আমার ভেতরটা তোলপাড় করা আবেগটা!

তারপর পরের দুই মেলায় আরও দু-তিন দিন রকিবদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ম্যারাথন আলাপ। আমার একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে সমাজ, পৃথিবী, এমনকি মহাবিশ্ব সম্পর্কেও আওড়ে যাচ্ছেন নিজের সরল দর্শন। এলিয়েনদের নিয়ে লেখা দানিকেন থেকে প্রভাবিত বইয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই বললেন, যৌবনে অতি উৎসাহী হয়ে এসব বই লিখেছি। এখনকার মতো মানসিক অবস্থা থাকলে ওসব ছাইপাঁশ লিখতামই না।

সমাজের কুসংস্কার নিয়ে কথা বললেন, উষ্মাও প্রকাশ করলেন। এই রকিবদা আমার কাছে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। আমি জানতাম, তিনি জনসমক্ষে নিজের চেহারা দেখাতে চান না। এ জন্যই বইয়ের প্রচ্ছদে কিংবা পত্রিকায় ছবি ছাপা হয় না। তাই বইমেলায় চরম তিন গোয়েন্দাভক্তও তাঁকে দ্রুত চিনতে পারে না। আমি কয়েকজনকে চিনিয়ে দিলাম, তারা গিয়ে রকিবদাকে ছেঁকে ধরল। রকিবদাও প্রাণ খুলে ওদের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেলেন।

এরপর ফোনে যোগাযোগ হতো মাঝেমধ্যে। কথা হতো।

৫.

রকিবদা চলে গেলেন। একটু আগেভাগেই গেলেন। একজন তরতাজা, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বিছানাগত হলেন। আর উঠলেন না, বিছানা থেকে লড়াই চালিয়ে গেলেন অসুখের সঙ্গে, অসীম প্রাণশক্তি নিয়ে নিয়মিত লিখেও যাচ্ছিলেন কিশোর আলোয়। কিন্তু জীবনপথের সব পথিককেই একসময় থামতে হয়, রকিবদাও থামলেন। আর চিরতরে বন্ধ হলো পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের গুপ্ত দরজাগুলো। সেগুলোর চাবি যে রকিবদা চিরদিনের জন্য নিয়ে গেছেন মর্ত্যলোক থেকে স্মৃতিলোকে। কিশোর, মুসা, রবিন তাই অভিভাবকহারা হয়ে কালের গর্ভে ইতিহাস হয়ে রইল।

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**

দ্বৈরথ

নাবিল মুহতাসিম

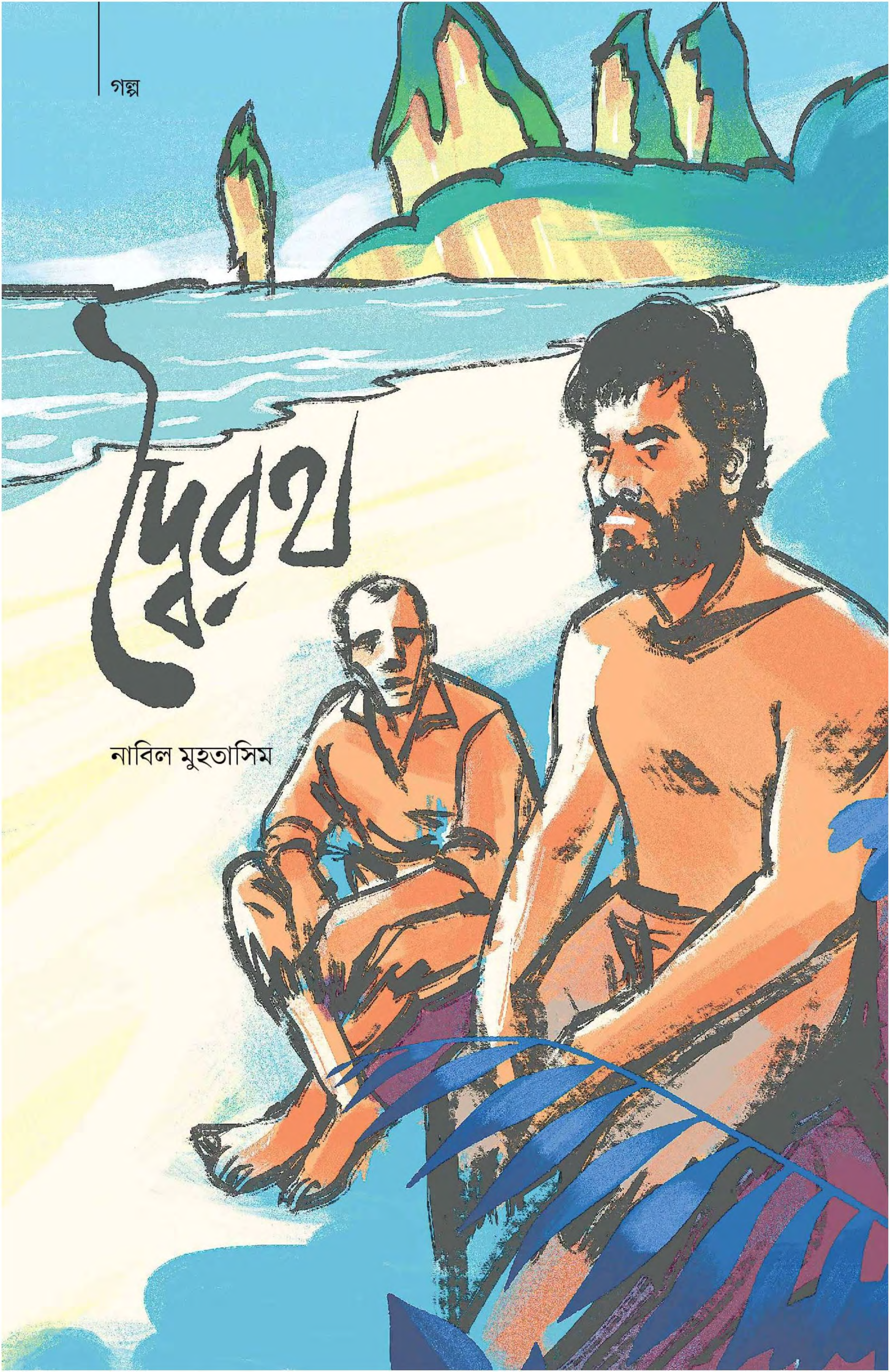

বাজপড়া!

শব্দটা কোথায় শিখেছিলাম, মনে নেই। কিন্তু এই যে দ্বীপে আটকা পড়েছি ফাটা কপালের দোষে, তাকে এই একটা শব্দে সুন্দর বোঝানো যায়।

তোমরা এখনই জানতে চাইবে, কীভাবে এলাম দ্বীপটায়। এখনকার দিনে আবার কেউ জাহাজডুবির শিকার হয়ে দ্বীপে আটকা পড়ে নাকি? পড়ে, যদি সে কার্গো শিপে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করে, আর তার জাহাজ যদি প্রশান্ত মহাসাগরের সাইক্লোনের মুখোমুখি হয়।

এটা নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না। শুধু সাইক্লোন হলে একটা কথা ছিল, তার ওপর আমাদের জাহাজ ইঞ্জিনের সমস্যায় পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে মাঝসমুদ্রে থেমে ছিল দেড় দিন। আমিই তো জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার, সমস্যাটা ধরার চেষ্টা করছিলাম আমার দুজন কলিগকে নিয়ে। হুট করে রেডিওতে ঝড়ের ঘোষণা; অস্বাভাবিক দ্রুত তৈরি হয়েছে সেটা এই মৌসুমে। এরপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ঝড়ের প্রথম ঝাপটাতেই আমাদের বোঝাই জাহাজের দফারফা। কাত হয়ে ডুবতে শুরু করার পর একটা লাইফবোটে ওঠার চেষ্টা করছি, এটুকুই মনে আছে। জ্ঞান ফিরল যখন, এই ছোট্ট দ্বীপের লেগুনের নীল পানিতে দোল খাচ্ছে লাইফবোটটা, সেটার ওপরে পড়ে ছিলাম আমি। আমার দু-তিনজন সহকর্মী তো একই লাইফবোটে ওঠার চেষ্টা করছিল, অন্য লাইফবোটে ছিল আরও অনেকে। তাদের কী হলো? জাহাজের কী হলো?

জানা নেই। যেমন জানি না, দ্বীপটা ঠিক কোথায়। তা নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামাইনি অবশ্য। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য খুদে দ্বীপের অভাব নেই। বেশির ভাগই জনমানবহীন এবং সেটার কারণ খুব সহজ। প্রথম কারণ : জনবহুল দ্বীপগুলো থেকে এরা বহু দূরে। দ্বিতীয় কারণটা আমার বিপদের মূলে। এসব দ্বীপে বেঁচে থাকার উপকরণের বড্ড অভাব।

দ্বীপটার সামান্য বর্ণনা দিলেই বুঝতে পারবে। সাদা ধবধবে বালুর সৈকত, সেটা ছাড়িয়ে একটু সামনে গেলেই পাথর শুরু। গোটা দ্বীপটাই পাথুরে। এলোমেলো জঙ্গল আর ঝোপে ভর্তি দ্বীপটা, খালি দ্বীপের মাঝখানে মাথা উঁচিয়ে থাকা পাথুরে টিলাটা ছাড়া। জঙ্গলটা এলোমেলো লন্ডভন্ড হয়ে আছে ঝড়ে।

'প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ' শুনলেই মনে পড়ে বাতাসে দুলতে থাকা নারকেলের পাতা। এই দ্বীপে একটাও নেই সেই গাছ। পানি? চারপাশের নোনা সমুদ্র বাদ দিলে খাবার পানি সামান্যই, পাথরের খোঁদলে ঝড়ের সময় যা একটু জমেছিল। লাইফবোট থেকে কোনোমতে নেমে এ রকমই একটা গর্ত থেকে খানিকটা পানি খেয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আমি।

খাবার? এই প্রশ্নের জবাব তোমাদের কী দেব, পাঠক! আমিই খুঁজে মরছি। নারকেল নেই, থাকলে শাঁস খেয়ে বাঁচা যেত। পাখির বাসা নেই, থাকলে ডিমটিম খোঁজা যেত। বন্য কোনো প্রাণী চোখে পড়েনি, থাকলে শিকার করার চেষ্টা করে দেখতাম। গাছপালা বিশেষ চিনি না, কোনোটার ফল বা শিকড় খাওয়ার মতো কি না, জানা নেই।

বড় একটা সমস্যা বারবার তাড়া করছে। গাছপালা সবই ভেঙেচুরে গেছে সাইক্লোনের ঝাপটায়। এই ঝড়েই গাছ থেকে পাখির বাসাটাসা উড়ে গেছে, ফলমূল কিছু থেকে থাকলে সেগুলোও গায়েব হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে হয়তো টুকটাক খাবার কুড়িয়েটুড়িয়ে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এক-দুই মাস বাঁচা যেত প্লেন বা জাহাজযোগে কোনো সাহায্য পৌঁছানোর আশায়, কিন্তু এখন একেকটা দিন পার করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

ঝড়ের ঠিক পরপর নয়, বরং ভালো আবহাওয়ার সময় যদি আটকা পড়তাম, তাহলে কিন্তু বেশ কিছুদিন রবিনসন ক্রুসোগিরি করা যেত। লাইফবোটে কোনো খাবারদাবার না আনতে পারলেও একটা ইমার্জেন্সি টুলবক্স রয়ে গেছে বাঁধা অবস্থায়। সেটায় পেয়েছি বেশ কিছু দরকারি জিনিস : সিগন্যাল দেওয়ার আয়না, একটা ফ্লেয়ার গান—পাবজি গেমে যেমন দেখেছ, নোনাপানি সূর্যের তাপে বাষ্প করার একটা যন্ত্র, ফ্ল্যাশলাইট, দেশলাই, পানির খালি পাত্র, ব্যান্ডেজ-আয়োডিন-কাঁচিসহ সামান্য ওষুধপত্র। একটা ছুরি, খানিকটা দড়ি, একটা তাঁবু। বড়শি আর সেটার সুতা।

বিশেষ করে শেষের কটা জিনিস পেয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরেছিল, বুঝতেই পারছ। তাঁবু খাটাতে পারলে রোদের তাপ থেকে মাথা বাঁচানো যায়। বড়শি আর সুতা থাকলে ছিপ বানাতে কতক্ষণ? লেগুনটায় মাছ ধরে খেয়ে বাঁচা যাবে। নোনাপানি রোদের তাপ দিয়ে বাষ্প করে আবার জমিয়ে মিষ্টি পানি বানিয়ে খেয়ে কষ্টেসৃষ্টে জীবনটা রক্ষা করা যাবে।

তাঁবুটা খাটালাম গাছপালার ধারে একটা জায়গায়। পানি বাষ্প করার যন্ত্রটা বালু খুঁড়ে বসিয়ে সেটাতে সাগরের পানি ঢাললাম। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা মোটামুটি চলনসই চারা গাছের কাণ্ড ছেঁটে ছিপ বানালাম। এবার একবুক আশা নিয়ে এগোলাম স্বপ্নের মতো সুন্দর লেগুনটার দিকে; রুই কাতলা, থুড়ি, মুলেট আর গোটফিশ ধরতে।

কোমরসমান স্বচ্ছ পানিতে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে শরীরের অর্ধেক ভিজিয়ে আর বাকি অর্ধেক রোদে পুড়িয়ে দুটো পুঁচকে মাছ ধরার পর বুঝলাম, মৎস্য শিকার সহজ নয়, অসীম ধৈর্য দরকার। টোপ হিসেবে দিয়েছিলাম ঝিনুকের মাংস। ভাগ্যিস, শামুক-ঝিনুকের অভাব নেই ছোট্ট সৈকতে। মাছ ধরার পরিকল্পনা ঠিকমতো কাজ না করলে ওগুলোকেই খাবারের উৎস হিসেবে বেছে নিতে হবে।

মাছগুলো কেটেকুটে একটা পাত্রে নোনাপানিসমেত চড়িয়ে শুকনা ডালপাতার আগুনে স্যুপের মতো কিছু একটা বানিয়ে খাওয়া সারলাম। ভাগ্যিস, দেশলাইটা ওয়াটারপ্রুফ। লাইফবোটে থাকা অবস্থায় পানিতে ভিজলেও খুব একটা ক্ষতি হয়নি।

শরীরে খানিকটা শক্তি ফিরে এসেছে। জাহাজ, সহযাত্রী, দেশ—এসব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে রেখেছি জোর করে। যে পরিস্থিতিতে আছি, সেটা নিয়ে ভাবা যাক বরং। সবার আগে, দ্বীপটা ভালোমতো ঘুরে দেখি। কাজের কিছু পাওয়া যেতে পারে, আরও ভালো কোনো জায়গাও পাওয়া যেতে পারে তাঁবু খাটানোর জন্য।

সবকিছু দেখতে দেখতে এগোলাম জঙ্গলের ভেতরের দিকে।

দ্বীপের মাঝখানে পাথরের টিলাটার গোড়ায় গিয়ে আবিষ্কার করলাম, এই দ্বীপে আমি একা নই।

টিলাটা খাড়া উঠে যায়নি, এখানে-ওখানে বেরিয়ে আছে পাখির বিষ্ঠায় সাদা হয়ে যাওয়া পাথর। তারই

একটার ওপর বসে আছে লোকটা; মাটি থেকে ফুট বিশেক উঁচুতে। আমাকে দেখছে শান্ত চোখে। বোঝা যাচ্ছে, আমার অস্তিত্বের ব্যাপারে আগে থেকেই জানে।

অনেকক্ষণ কোনো কথা ফুটল না আমার মুখে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি লোকটাকে। খালি গা, পরনে একটা হাফপ্যান্ট শুধু। রোদে পোড়া তামাটে একহারা দড়ির মতো শক্ত শরীর, দুই হাতজুড়ে ট্যাটু করা। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, কালো। চোখের দৃষ্টিতে বোঝা যায়, কঠিন ধাতুতে গড়া লোক। বয়স আমার চেয়ে বছর পাঁচেক বেশি হবে, মানে পঁয়ত্রিশের মতো।

'হ্যালো,' বলল লোকটা। কথার টানে বোঝা যাচ্ছে, ইংরেজি তার মাতৃভাষা নয়। কিন্তু লোকটা নিশ্চিত ইউরোপীয়। তাহলে—

আমি তখনো কথা বলতে পারার মতো অবস্থায় আসিনি, তাই জবাব দেওয়া হলো না। সেই বিরতিতে লোকটা অনিশ্চিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'ওলা? কোমো এস্তাস?'

সেই অবস্থায়ও বুঝলাম, আমার দক্ষিণ এশীয় চেহারা দেখে মেক্সিকান বা লাতিন আমেরিকান ভেবে ভুল করেছে লোকটা। আর এটা তার নিজের ভাষাও বটে, স্প্যানিশ। জড়তা ভেঙে বললাম, ইংরেজিতেই, 'হ্যালো। আমার নাম রূপু। আমি বাংলাদেশি। আপনি?'

'মিগেল দেলগাদো।' লোকটার কথায় এমন একটা ভাব, যেন নাম শুনলেই চিনব। একমুহূর্ত থেমে যোগ করল, 'আমি স্প্যানিশ। পৃথিবীর নানা দুর্গম জায়গায় ঘুরি আর সেগুলো নিয়ে বই লিখি, ভিডিও বানাই। খানিকটা বিখ্যাতও হয়ে উঠেছি এর মধ্যে। একটা স্কুনারে করে বেরিয়েছিলাম সারা দুনিয়া একা চক্কর দেব বলে। খবরে বেরিয়েছে, আপনি হয়তো দেখেননি। আমার ইচ্ছা, পুরো যাত্রা শেষ হওয়ার পর জম্পেশ একটা বই লিখব। অর্ধেক দুনিয়া পেরোনোর পর আপাতত সেই স্কুনার ঝড়ের ঘায়ে সমুদ্রের তলায়। কোনোমতে এই দ্বীপে এসে উঠেছি।'

'আমি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। আমার জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল, কোনোমতে একটা লাইফবোটে করে এসেছি এখানে,' আমি বললাম। কেন যেন মনে হচ্ছে, লোকটার সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভালো। অথচ দ্বীপে আরেকজনের দেখা পেয়ে কি আমার খুশি হওয়ার কথা নয়?

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না দেলগাদো। শুকনো ঠোঁট জিব বুলিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার একটা বোট আছে, বললে?'

'আছে, কিন্তু সেটায় করে কত দূর যেতে পারব, তাতে সন্দেহ আছে। নিশ্চিতভাবে কোনো দ্বীপের অবস্থান যদি জানতে পারতাম ধারেকাছে, তাহলে একটা কথা ছিল। তবু কঠিন ব্যপার। প্রচুর খাবারদাবার সঙ্গে না নিয়ে বোটে ওঠা মানে মৃত্যুর দরজায় নিজে থেকে হাজির হওয়া,' বললাম আমি। একটু বেশিই বোধ হয় বলে ফেললাম। লোকটার উপস্থিতি কেমন অস্বস্তির জন্ম দিচ্ছে মনে।

'দ্বীপটা বড্ড ছোট, আর খাবারও নেই।' দেলগাদো ঠান্ডা বাদামি চোখে আমাকে মাপতে মাপতে বলল। 'আশা করি, আমাদের দুজনকে...কোনো রকম অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হবে না।'

'আমিও তা-ই আশা করি,' বললাম আমি। বাইরে হয়তো বুঝতে দিচ্ছি না, কিন্তু মাথার ভেতর যে চিন্তার ঝড় চলছে, সেটার গতিবেগ গতকালকের সাইক্লোনের চেয়ে বেশি। এতক্ষণ কথা বললাম, কিন্তু পাথরের টিলা থেকে নামার কোনো লক্ষণ দেখায়নি দেলগাদো। পাশের পাথরের ওপর কী রেখেছে সে ওটা, একটা খাপে পোরা ভোজালি না? ম্যাশেটি বলে যাকে। এ রকম সারভাইভাল পরিস্থিতিতে খুবই কাজে দেয়, আবার কাউকে ঘায়েল করতেও এর জুড়ি নেই।

দেলগাদোর শীতল আচরণ আর ভোজালির চেয়ে যেটা বেশি নাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে, সেটা চোখে পড়েছে চলে আসার সময়। কোনো রকম বিদায় সম্ভাষণ না করেই ঘুরে চলে আসছি, খেয়াল করলাম দেলগাদোর হাফপ্যান্টের পকেট থেকে উঁকি মারছে একটা যন্ত্রের মতো কী যেন, খাটো অ্যান্টেনাসহ। সাগরে সাগরে বেড়াই, ওই জিনিস আমার চেনা। বহনযোগ্য জিপিএস ইউনিট।

তাঁবুতে ফিরে এসে ঘোরের মধ্যে বসে থাকলাম খানিকক্ষণ। জিপিএস আছে দেলগাদোর কাছে। আমার আছে নৌকা। হোক ছোট, হোক কোনো ইঞ্জিন বা পাল বা বইঠা নেই সেটার সঙ্গে। তাঁবু দিয়ে পাল বানানো যাবে, গাছের ডাল কেটে বানানো যাবে বইঠা। দেলগাদোর জিপিএস দেখে সবচেয়ে কাছের অন্য কোনো দ্বীপে চলে যাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। তাহলে?

আমাকে দেখেই অমন আচরণ কেন করল দেলগাদো, যেন আমি তার জাতশত্রু?

বিকেল হয়ে এসেছে। রাতের খাবার জোগাড়ের জন্য মাছ শিকারে নামলাম এবং আরেকবার বুঝলাম পরিস্থিতি ঠিক কতটা খারাপ। সকালে তা-ও কিছু মাছ পেয়েছিলাম, এবার যে কয়টা ধরতে পারলাম ঘণ্টা তিনেকের মেহনতে, তাতে পেটের সিকিও ভরবে না। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে মাছ ভেগেছে? নাকি সৈকতের কাছাকাছি কখনোই সহজে মাছ পাওয়া যায় না? জানি না। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের এসব শেখানো হয় না। অথচ আগেকার দিনের নাবিকদের এগুলো না জানলে চলত না, জীবন-মরণের ব্যাপার ছিল এসব জ্ঞান।

আমার জন্যও তা-ই, তিক্তমুখে ভাবলাম আমি কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার মাছ বড়শিতে পেয়ে। এগুলো খাওয়া যায়? নাকি খেলে ভেদবমি করতে করতে অক্কা? নাকি খেতেও হবে না, হাত দিয়ে ধরলেই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হব? নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় নেই। আপাতত ঠিক করলাম, বিদ্‌ঘুটে চেহারার কোনো মাছ না ছোঁয়াই ভালো।

মাছগুলো আগের মতো রান্না করে খাওয়া সারলাম সন্ধ্যার পরপর। খাওয়া শেষ, রাত নেমেছে, মাথার ওপর তারার চাঁদোয়া। আমি যে আগুনের সামনে কেন বসে রইলাম অত রাত পর্যন্ত, নিজেই জানি না। নাকি জানি? এত সতর্কতার সত্যি কি দরকার আছে?

পরদিন সকালে মাছ পেলাম আরও কম। একে তো তেল-মসলাহীন অচেনা মাছ খেতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে, তার ওপর আবার পরিমাণে ঘাটতি। এ রকম চলতে থাকলে পুরোদমে শামুক-ঝিনুক খাওয়া শুরু করতে হবে।

আরেকটা উপায় আছে। দুপুরের দিকে ভেবে ভেবে বের করলাম। ঝামেলাটা হয়েছে কী, আমার লাইফবোট যেখানে ভিড়েছে, সেই সৈকতেই আমি ঘুরপাক খাচ্ছি। আজ দ্বীপের অন্য কোনো দিকে যাওয়া ভালো। সমস্যা

তো নেই, একটা দ্বীপের চারধারেই সৈকত থাকে। অন্য কোনো দিকে ভাগ্য বাজিয়ে দেখা যাক।

দ্বীপের উল্টো দিকে যেতে হলে মাঝখান দিয়ে যাওয়াই সুবিধা। আপনমনে সেদিকে যেতে গিয়ে অবধারিতভাবে এসে পড়লাম দ্বীপের মাঝখানের টিলাটার কাছে।

সবচেয়ে উঁচুতে পা ছড়িয়ে বসে আছে দেলগাদো। কালকের মতোই ভঙ্গি, কালকের মতোই খালি গা, চোখে শীতল দৃষ্টি। আমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়েছে, অথচ তার অবস্থানের যেন কোনো নড়চড় হয়নি।

কিছু বলার সুযোগ পেলাম না। দেলগাদোই বলতে শুরু করল, চোখে চোখ রেখে, 'আমার মনে হয়, আমাদের দেখা না হওয়াই ভালো। তুমি দ্বীপের কিনারার দিকটা নাও, চারপাশটা, আমি মাঝখানটা নিচ্ছি। গাছপালা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখান থেকে। ভেবে দেখো, তোমার সুবিধা বেশি। পানি থেকে মাছ শিকার করতে পারবে। সমুদ্রের জল থেকে কোনোভাবে মিষ্টি পানি বের করার বন্দোবস্ত থাকলে সেটাও করতে পারবে। শুধু আমার এলাকায় পা দিয়ো না, তাহলেই আমাদের ভেতর কোনো ঝামেলা হবে না। এই দ্বীপ... বুঝতেই পারছ, দুজন মানুষের টিকে থাকার মতো বড় নয়। এলাকা ভাগ না করলে দুজনেরই বিপদ।'

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে আমার গায়ের জামা। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই দিগন্ত পর্যন্ত।

'আমরা কি একে অন্যকে সাহায্য করতে পারি না?' অবশেষে প্রশ্ন করলাম আমি।

জবাব নেই।

'তোমার জিপিএস, আমার লাইফবোট। আশপাশের কোনো ভালো দ্বীপে চলে যাওয়া যায় না? খাবার পাব, সভ্য জগতেও ফেরা যাবে।' প্রস্তাব দিলাম আমি।

'প্রচুর খাবার ছাড়া বোটে ওঠা যাবে না, সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। দুজনের খাওয়ার মতো খাবার আমাদের নেই...এখনো।' বলল দেলগাদো। খেয়াল করলাম, রোদে পুড়ে আরও ট্যান হয়েছে তার চামড়া। চোখের কোণে কালি।

'আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই না।' সোজাসাপটা গলায় বললাম আমি। 'আমরা মিলেমিশে...'

'মিথ্যে কথা!' খেঁকিয়ে উঠল দেলগাদো। 'আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি দুনিয়াটা, রূপু। খিদে, তেষ্টা আর বাঁচার আকুতি মানুষকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যায়, সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু আমি নিজ চোখে দেখেছি সেটা। মৌরিতানিয়ায় যখন আমাদের দলের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল সাহারা মরুভূমির মাঝখানে, যখন একে একে মরতে শুরু করল সবাই, তখন একঢোঁক পানির দখল নেওয়ার জন্য এক বন্ধু আরেক বন্ধুর গলা টিপছে, এই দৃশ্য দেখেছি আমি। এভারেস্টে চড়ার সময় অসুস্থ সঙ্গীকে পথের পাশে ফেলে রেখে এগিয়ে গেছি আমি নিজেই!' থেমে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল দেলগাদো। 'আমি চাই না এমন কিছু হোক। আজ তুমি বন্ধুত্বের কথা বলছ, খাবারে টান পড়লে কালই আমার মাথায় বাড়ি মারতে চাইবে। তার চেয়ে ভালো, এলাকা আলাদা করে ফেলা।'

'এখানে তুমি কী খাবে? সাগরের তীরে বরং মাছটাছ ধরতে পারবে,' বললাম আমি।

'আমার খাবারের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না,' ক্লান্ত গলায় বলল দেলগাদো। 'পানিও খানিকটা আছে পাথরের খাঁজে...বাদ দাও। ভাগ্য যদি ভালো হয় আমাদের, কোনো রেসকিউ প্লেন বা জাহাজ চলে আসবে। আর না এলে...'

কথা শেষ করল না দেলগাদো। আমিও শোনার অপেক্ষায় রইলাম না। ঘুরে চলে এলাম 'নিজের এলাকায়', সৈকতে। হেঁটে খানিকটা দূরে গিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম।

মাথা কাজ করছে না। মনের ভেতর একটা অংশ বলছে, দেলগাদোর স্রেফ পাগলামি এসব। আবার আরেকটা অংশ বলছে, দেলগাদো আমার চেয়ে দুনিয়া দেখেছে অনেক বেশি। ভেবেচিন্তেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

দেলগাদো অমনভাবে পাথরের ওপর বসে আছে

'দ্বীপটা বড্ড ছোট, আর খাবারও নেই।' দেলগাদো ঠান্ডা বাদামি চোখে আমাকে মাপতে মাপতে বলল। 'আশা করি, আমাদের দুজনকে...কোনো রকম অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হবে না।'

কেন, তা বুঝতে পারছি এখন। ওটাই তার কাছে কৌশলগত নিরাপদ অবস্থান। আমাকে সরাসরি শত্রু ভাবছে সে। আমারও কি তা-ই ভাবা উচিত?

মাছ পাচ্ছি না এখানেও। রোদে চড়চড় করছে সারা গা। দুটো হাস্যকর রকমের ছোট মাছ ধরার পর কয়েকটা ঝিনুক নিয়ে উঠে এলাম। আপাতত এগুলো খেয়েই থাকতে হবে। সন্ধ্যায় আবার নামতে হবে রাতের খাবারের খোঁজে।

দুটো দিন কেটে গেল। মাছ ধরায় কোনো আহামরি সাফল্য পাচ্ছি না, আবার কমছেও না। কয়েকটা মাছ, কয়েকটা ঝিনুক আর পানি খেয়ে জীবনধারণ। অবসর সময়টা কাটাই তাঁবুর ছায়ায় বসে দিগন্তে পানির ঝিলিমিলির দিকে তাকিয়ে।

কোনো জাহাজের ছায়া পড়ে না সেখানে। আকাশেও দেখি না কোনো উড়োজাহাজের অবয়ব।

আরও তিনটা দিন কেটে গেল। বোটের ইমার্জেন্সি টুলকিটে পাওয়া জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখি মাঝেমধ্যে। ঠিকঠাক সারভাইভাল ট্রেনিং থাকলে মনে হয় অনেক কিছু করে ফেলতে পারতাম এসব দিয়ে! হয়তো দেলগাদো পারবে। কিন্তু আমি ভয় পাই দেলগাদোকে, আর সে আমাকে।

ইদানীং রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে না। বারবার চমকে জেগে উঠে তাঁবু সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, পায়ের শব্দ

এগিয়ে আসছে কি না। স্বপ্নে দেখি, দেলগাদোর ভোজালি ধরা হাত উঠে যাচ্ছে আকাশে, তারপর নামছে বিদ্যুৎবেগে। তারপর আমার লাইফবোট চুরি করে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে দেলগাদো। ঘেমেনেয়ে জেগে উঠি ধড়মড় করে।

স্বপ্নটা পুরোপুরি অমূলক মনে হয় না। গতকাল রাতে আগুন নেভাতে যাব, হঠাৎ কী ভেবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম গাছপালার সীমানার দিকে। গাছের আড়ালে ওটা কী দেখলাম? একটা মানুষের ছায়া দাঁড়িয়ে আছে... খালি গা... হাফপ্যান্ট পরনে... হাতে লম্বা ওটা কী? চোখ পিটপিট করে আবার তাকালাম, চোখে পড়ল না কিছু। সত্যি দেখেছি, না চোখের ভুল?

দেলগাদো আমার ওপর নজর রাখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমিও নজর রাখছি তার ওপর। গত পরশু ঘোর সন্ধ্যায় পা টিপে টিপে গাছপালার আড়ালে-আড়ালে চলে গিয়েছিলাম দ্বীপের অনেকটা ভেতরে। তেরছা একটা দিক ধরে গিয়েছিলাম। দেখেছি, টিলার ওপরে ঠিক আগের মতোই বসে আছে মিগেল দেলগাদো। না, একটু ভুল হলো। ঠিক আগের মতো নয়। পিঠটা যেন একটু কুঁজো হয়ে গেছে, একটা বোতল খুলে যখন পানি খাওয়ার চেষ্টা করল, ছিপি খুলতে যেন অস্বাভাবিক বেশি সময় লাগল তার। বোতলের তলার দুই আঙুল পানি খেয়ে আবার একদিকে হেলে পড়ল দেলগাদো। বোঝাই যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে পড়ছে সে।

আমিও কি ঠিক আছি? হাঁটার জোর পাই না। মাছ ধরতে গিয়ে এক ঘণ্টাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না কোমরপানিতে। আজ কেবল একটা মাঝারি আকারের মাছ পেয়েছি, বাকি খাবারের জোগাড় করতে হয়েছে একটা ছোট কাঁকড়া আর ঝিনুক দিয়ে।

আজ আবার মেঘ করেছে। দমকা হাওয়াও বইছে থেমে থেমে। লাইফবোটটা একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখেছি, বেশ দুলছে ওটা। একটা সাইক্লোন হয়ে যাওয়ার কত দিন পর আরেকটা আসে? আবার একটা হবে নাকি?

পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বাইরের সাহায্য আসার সম্ভাবনা খুব কম। বোটটা নিয়ে রওনা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হতো, যথেষ্ট শক্তি শরীরে অবশিষ্ট থাকতে। কিন্তু বোটে বেশ অনেকটা খাবার আর পানি বোঝাই করতে হবে আগে। আর লাগবে একটা পাল, একটা হাল আর একটা বইঠা। তার চেয়ে বেশি দরকার : মানচিত্রের জ্ঞান। জানতে হবে, সবচেয়ে কাছের কোন দ্বীপে গেলে সাহায্য পাওয়া যাবে, আর সে দ্বীপ কত দূরে। দেলগাদোর জিপিএসে আছে সে তথ্য। কিন্তু দেলগাদো সাহায্য করবে না আমাকে, আর সেটার কারণটাও বেশ পরিষ্কার। দুজন লোকের বেশ কয়েক দিন চলার মতো খাবার আর পানি পাব কোথায়? ওসব ছাড়া বোটে ওঠা মানে খোলা আকাশের নিচে ক্ষুধা-তেষ্টায় ধুঁকে ধুঁকে শেষ হওয়া।

ছিপ আর বড়শি নিয়ে কোমরপানিতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এসব। ফাতনায় বেমক্কা টান পড়তে বাস্তবে ফিরলাম। পরমুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল রশি টানাটানির খেলা। বোঝা যাচ্ছে, বেশ বড়সড় একটা মাছ পড়েছে বড়শিতে।

মিনিট বিশেকের চেষ্টায় মাছটা ডাঙায় তুলতে পারলাম যখন, আমার হাসি দুকান ছুঁয়েছে। প্রায় আড়াই ফুট লম্বা একটা ধুমসো মাছ, ওজন কমসে কম আট-নয় কেজি তো হবেই। ধূসর রং, বিরাট মাথা আর মুখ। নিরীহ এই মাছ খেতেও দারুণ হবে, সন্দেহ নেই। আর বিষের ভয়? এমন সাদামাটা চেহারার মাছ বিষাক্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

মাছটা কেটেকুটে নিয়ে বেশ কয়েকটা টুকরো করলাম। মাথাটা দিয়ে বানাব স্যুপ, আর বাকি খানিকটা এখন সেদ্ধ করে খাব, আর খানিকটা ধোঁয়ায় শুকিয়ে জমিয়ে রাখব পরে খাওয়ার জন্য।

খাওয়াটা হলো জম্পেশ।

একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম খাওয়ার পর। চোখ লেগে আসছিল, এমন সময় খেয়াল করলাম সমুদ্রটা দুলতে শুরু করেছে। টেবিল নড়ালে গ্লাসের পানি যেমন এদিক-ওদিক দোলে, তেমনি করছে সাগরের নীল পানি।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তখনই বুঝলাম, সাগর নয়, দুলছে আমার মাথা। সামলানোর সময় পেলাম না, দমকে দমকে বমিতে ভাসিয়ে দিলাম চারপাশ।

কাঁপা হাতে খানিকটা পানি খাওয়ার পরে ভেবেছিলাম, বমির ভাবটা কেটে গেছে। খালি পেটে বেশি খাওয়ার জন্য হয়েছে এমনটা, ধরেই নিয়েছি। পরের দফা বমি শুরু হলো ঠিক তখনই।

বমিটা যে স্বাভাবিক নয়, সেটা বুঝলাম দুটো কারণে। প্রথম কারণ, বমি থামছেই না। দ্বিতীয় কারণ, হাত-পায়ে জোর পাচ্ছি না একদমই। বমির জন্য হচ্ছে না এমনটা, পেট খারাপ হলে এ রকম গা ঝিম ঝিম করে অবশ হয়ে আসতে শুরু করে না পুরো শরীর।

ব্যাখ্যা একটাই। মাছটা খেয়ে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি আমি।

তাঁবুর ভেতর অর্ধেক শরীর আর রোদে অর্ধেকটা রেখে পড়ে আছি আমি, নড়ার ক্ষমতা নেই। একটু আগে পর্যন্ত পানি খেতে পারছিলাম, এখন সেটাও আর সম্ভব নয়।

এ-ই ছিল কপালে! মনে মনে হাসছি আমি, তেতো হাসি। জাহাজডুবি থেকে বাঁচলাম, বিষাক্ত মাছ খেয়ে মরার জন্য? তবে তা-ই হোক। দেলগাদো, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর অবশিষ্ট রইল না। দ্বীপের সব 'সম্পদ' এখন তোমার। আমি টেঁসে গেছি, এটা টের পাওয়ার পর বোটটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে আর কোনো বাধা নেই তোমার।

মুখের ওপর একটা ছায়া পড়ল। কোনোমতে চোখের পাতা খুললাম। অভিযাত্রিক দেলগাদো ছাড়া আর কে! পাথরের মতো ভাবলেশহীন চোখে দেখছে আমাকে। বলতে চাইলাম, কষ্ট করে মারতে হবে না আমাকে, নিজেই মরছি। কিন্তু ততক্ষণে আরেক দিকে সরে গেছে দেলগাদো। আমার শেষ সম্বল থালা-বাটি-কম্বল নেড়েচেড়ে দেখছে বোধ হয়, কোনগুলো মেরে দেবে। যা ইচ্ছা নিক, আমার তো আর দরকার পড়বে না সেগুলো।

আবার আমার কাছে ফেরত এসেছে দেলগাদো। হাতে লম্বা কী যেন। ভোজালিটা নাকি?

'মাছটা কতক্ষণ আগে খেয়েছ?' নিশ্চয়ই মাছের অবশিষ্টাংশ চোখে পড়েছে তার। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রশ্ন জানার জন্য এত আগ্রহ কেন? আবার করল প্রশ্নটা। আমি কোনোমতে ঘড়ঘড়ে গলায় বলতে পারলাম, 'ঘ-ঘণ্টাখানেক...'

আবার সরে গেল দেলগাদো। হতেও পারে, এই দেখা শেষ দেখা। এবার বোধ হয় আমার জিনিসগুলো বাঁধাছাঁদা করে বোটে উঠে চম্পট দেবে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যে

ফিরে এল দেলগাদো। আমাকে টেনে তুলে হেলান দেওয়াল একটা পাথরের গায়ে। মুখের কাছে তুলে ধরল কী যেন। দেখলাম, কুচকুচে কালো দুটো বড়ি। বিষ? সে তো ইতিমধ্যেই খেয়ে ফেলেছি।

'অ্যাকটিভেটেড চারকোল ট্যাবলেট,' দেলগাদো বলল। 'তোমারই টুলবক্সে ছিল। খেয়ে নাও। বিষক্রিয়া পুরোপুরি দূর না করলেও অনেকটা কমাতে পারবে।'

খানিকটা পানি আর ট্যাবলেট দুটো আমার মুখে তুলে দিল দেলগাদো। বলছে, 'সিগুয়াটেরা পয়জনিং। একটা সামুদ্রিক গুল্ম খাওয়ার কারণে গ্রুপার মাছের মধ্যে এই বিষক্রিয়া তৈরি হয়। ভাগ্য ভালো হলে এ যাত্রা বেঁচে যাবে।'

মিনিট পনেরোর মধ্যে চারকোল ট্যাবলেটের কাজ শুরু হলো। খানিকটা শক্তি ফিরে পেয়েই করলাম অবধারিত প্রশ্নটা, 'আমাকে মরে যেতে দিলে না কেন?'

'তোমাকে বাঁচালে আমার লাভ বেশি। নৌকায় হাল ধরে থাকার জন্য একজন দরকার। আমি পাল ধরে থাকতে ব্যস্ত থাকব। আর তা ছাড়া আমি খুনি নই। দুটো ট্যাবলেট খাওয়ালে যদি কারও জীবন বাঁচে, সেটা করব না কেন?' দেলগাদো আমাকে আরেকটু পানি খাওয়াতে খাওয়াতে বলল।

'লাইফবোটে কোনো হাল থাকে না।' আধা অবশ হাতে মুখ মুছে বললাম আমি।

'থাকে, যদি সেটা বানিয়ে নেওয়া যায়।' পাশে পড়ে থাকা লম্বা জিনিসটা তুলে দেখাল দেলগাদো। এটাই তখন তার হাতে ছিল। কাঠ কেটে বানানো একটা এবড়োখেবড়ো হাল। দেখতে যেমনই হোক, কাজ চলে যাবে।

'তোমার তাঁবু কেটে বানাব পাল। আর হালটা ধরে থাকবে তুমি।' দেলগাদো বলল।

তা-ই করলাম, তিন দিন পর আমি মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পর যখন সমুদ্রে লাইফবোটটা ভাসালাম আমরা। এখনো দুর্বল আমি হেলান দিয়ে বসে ধরে আছি হালটা, আর দেখছি পালের দড়ি ধরে পিঠ সোজা করে পা ছড়িয়ে বসে আছে দেলগাদো। চোখ সামনে। হাতে জিপিএস। দেড় শ নটিক্যাল মাইল দূরে রয়েছে সবচেয়ে কাছের দ্বীপটা, সেটা যেন মিস না হয়ে যায় কোনোভাবে।

খিদে পেয়েছে আমার। হাতের কাছের একটা ব্যাগে রয়েছে রোদে শুকানো প্রচুর পাখির মাংস, সেটার খানিকটা বের করে খেতে শুরু করলাম।

সবই দেলগাদোর সংগ্রহ। সাগরের মাঝখানে দ্বীপ দেখলেই সেটার সবচেয়ে উঁচু জায়গায় এসে বসার চেষ্টা করে সামুদ্রিক পাখিরা। তখন সেগুলোকে শিকার করা কঠিন নয় দক্ষ কারও জন্য।

তোমরা কী ভেবেছিলে, এমনি এমনি পাথরের টিলাটার ওপর বসে থাকত দেলগাদো?

অলংকরণ : **এস এম রাকিব**

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

▪ **EIIN:108572.**

৩০ ও ৪৪ গরিব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১ এবং ডিয়াবাড়ি (**মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মাত্র ৭৫ গজ দূরে**), তুরাগ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০। www.milestonecollege.com, facebook/MilestoneCollegeUttara

- শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি: ২০০৮ সালে ঢাকা বোর্ড কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
- এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি এবং পিইসি পরীক্ষার ফলাফল (বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি ভার্সন):

এইচএসসি	২০২৪ সালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৩১০৭ জন। পাসের হার ১০০%। জিপিএ-৫ অর্জন করে ২০০০ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পায় ১৯৫২ জন। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১০ম ও ৭ম স্থান অর্জন করে।
এসএসসি	২০২৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৮৬৬ জন। এ বছর ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৬৭.৫১% হলেও মাইলস্টোন কলেজে পাসের হার ছিলো ৯৭.২১%। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাসের হার ৯৮%। ২০০৯, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ৫ম, ১০ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে। ২০২০ সালে শতভাগ পাসের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরে মাইলস্টোন কলেজের অবস্থান 'প্রথম স্থান'।
জেএসসি	২০১৯ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ৫৮৯ জন। ২০১৭ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ৮৪৮ জন। জেএসসিতে ২০১০, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১৩তম, ৭ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
পিইসি	২০১৯ সালে ১১৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ১১৩৮ জন। জিপিএ-৫ অর্জনের হার ৯৬.৩৬%। ২০১১ ও ২০১২ সালে ৪র্থ স্থান এবং ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সারাদেশে ৩য় স্থান অর্জন করে।

- বিশেষ সুবিধা: মফস্বল এলাকার ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল এবং পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- ছেলে ও মেয়েদের এবং বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনের ক্লাস পৃথক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।
- এতিম, দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাবান্ধব এমএনআরএস ট্রাস্টের বৃত্তি সুবিধা পেয়ে থাকে।
- দেশসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম একটি মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা কর্নেল নুরন্ নবী (অব.)। ফৌজদারহাট ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল নুরন্ নবী; যিনি রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে স্বপ্নকারিগর নুরন্ নবী স্যার বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন মাইলস্টোন কলেজের সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে। মূলত: এই প্রাজ্ঞজনের দিকনির্দেশনায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এগিয়ে থাকছে সেরাদের সেরা হওয়ার পথে।

- কলেজটি এমএনআরএস ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত। উত্তরাস্থ মেইন ক্যাম্পাস ছাড়াও উত্তরা ৩য় প্রকল্পের ডিয়াবাড়িতে (মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে) ২৫ বিঘা জমির উপর অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস। খেলাধুলার জন্য বিশাল মাঠ, মানসম্মত শিক্ষার জন্য অবকাঠামোগত সকল প্রকার সুবিধাদিসহ ক্যাম্পাসটিতে ৮০০ আবাসিক ছাত্রছাত্রীসহ সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ঢাকার বাইরে গাজীপুর ব্যতীত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের কোনো শাখা বা ক্যাম্পাস নেই।

-মোহাম্মদ জিয়াউল আলম, অধ্যক্ষ
মাইলস্টোন কলেজ।

-রিফাত নবী আলম, নির্বাহী অধ্যক্ষ
মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল

গোয়েন্দা শামসু ও তিন বোতল তেল

আহমেদ রিয়াজ

ডোরবেলের শব্দে পেয়ে সদর দরজা খুললেন আবদুল হাই। তাকে দেখেই দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বলল, 'আমি "সমস্যা সমাধান ডট কম" থেকে এসেছি। এই ঠিকানায় ওখানে একটা কেস ফাইল হয়েছে।'

আবদুল হাই বললেন, 'হ্যাঁ। কেসটা আমিই ফাইল করেছি। আপনি?'

'আমি গোয়েন্দা শামসু। আপনার কেসটা নিয়ে কাজ করতে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজার এক পাশে সরে দাঁড়ালেন আবদুল হাই। বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকলেই বসার ঘর। ছয় আসনের সোফা সেট দিয়ে সাজানো। দুই আসনের সোফাটায় বসলেন গোয়েন্দা।

আর এক আসনের একমাত্র সোফায় বসলেন আবদুল হাই। আর তিন আসনের সোফার ওপর কিছু বই।

আবদুল হাই জানতে চাইলেন, 'তা আপনার কাজের ধরনটা কী রকম? শার্লক হোমস বা এরকুল পোয়ারোর মতো? নাকি রবার্ট ল্যাংডন, অগাস্ত দুঁপো কিংবা ফিলিপ মারলোর মতো?'

'আমি কাজ করি আমার মতো।'

'সেটাই ভালো। আমার কাজটা শেষ করতে কত দিন লাগতে পারে?'

'কী করতে হবে, আমি কিন্তু এখনো জানি না।'

আবদুল হাই বললেন, 'তেল খুঁজে বের করতে হবে।'

হোঁচট খেলেন গোয়েন্দা। 'তেল!'

'হ্যাঁ। তেল। তিন বোতল তেল। একেক বোতলে তিন শ মিলিগ্রাম।'

'তেল খুঁজে বের করার জন্য আপনি গোয়েন্দা ভাড়া করেছেন?'

'সমস্যা কোথায়? আপনি প্রাইভেট গোয়েন্দা। ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ীই তো কাজ করবেন! নাকি বেছে বেছে কাজ নেন?'

'আপনার প্রয়োজনমতোই কাজ হবে।'

'গুড। আগেই জানিয়ে রাখি, জায়গামতো অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তেল নিয়ে ওদের কোনো আগ্রহই দেখলাম না। সাধারণ ডায়েরি করতে চাইলাম, সেটাও করল না।'

বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আবদুল হাই।

শামসু বললেন, 'আমাকে তিন বোতল তেল খুঁজে বের করতে হবে, এই তো?'

'ঠিক।'

'তেলের কোনো স্যাম্পল আছে?'

'নেই। তবে যেসব বোতলে তেল ছিল, সেই বোতলের স্যাম্পল আছে। দেখবেন?'

বলেই আর জবাবের অপেক্ষা করলেন না আবদুল হাই। দ্রুত হেঁটে ডান পাশের ঘরে চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজের কার্টন নিয়ে এলেন। কার্টনের ভেতর থেকে একগাদা খড় সরিয়ে একটা শোলার বাক্স বের করলেন। বাক্স খুলতেই বেরিয়ে এল একটা বোতল। বোতলটা গোয়েন্দার হাতে দিয়ে বললেন, 'এ রকম তিন বোতল তেল গায়েব।'

বোতলের ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকলেন শামসু। জানতে চাইলেন, 'কী তেল ছিল ভেতরে?'

'আমি জানি না। তবে তেলটা খুবই উপকারী। নিয়মিত মাখলে পাকা চুল কালো হয়, চুল পড়া বন্ধ হয়। এমনকি নতুন চুলও গজায়।'

মুচকি হেসে গোয়েন্দা বললেন, 'তেল মাখলে নতুন চুল গজায়, এটা আপনি বিশ্বাস করেন?'

'আগে করতাম না। কিন্তু এই তেল ব্যবহার করে বিশ্বাস জন্মেছে। আমার মাথার দিকে তাকান! চুল দেখে কি মনে হয় এ মাথার বয়স বাহাত্তর বছর?'

আবদুল হাইয়ের মাথায় তাকালেন শামসু। মাথাভরা ঘন কালো চুল। বললেন, 'আমি তো প্রথমে দেখে ভেবেছি, চুলে নিয়মিত কলপ দেওয়া হয়।'

'অনেক বছর কলপ দিয়েই তো ভুলটা করেছিলাম। মাথা প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল। এই তেল মাখার পর সাদা চুল কালো তো হয়েছেই, দুমাসেই ঘন কালো চুলে মাথা ভরে গেছে।'

স্বীকার করলেন গোয়েন্দা, 'খুবই দুর্লভ তেল।'

'একেক বোতল তেলের জন্য তিন লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছে। তিন বোতলে ৯ লাখ। প্রতি বোতল পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রি করার জন্য আনিয়েছিলাম। ক্লায়েন্টও রেডি ছিল। এমনকি অর্ধেক টাকা অগ্রিমও পেয়েছি। কিন্তু বোতল এসেছে, তেল আসেনি।'

'এই তেল আসে কোত্থেকে?'

'সেটা বলা যাবে না। ব্যবসায়িক গোপনীয়তা। বোতলপ্রতি দুলাখ টাকা লাভ করতে চাইলে গোপনীয়তা ধরে রাখতেই হবে।'

'তিন বোতলই কি একই কুরিয়ারে পাঠানো হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। তবে তিন নয়। এ পর্যন্ত চার বোতল তেল পাঠানো হয়েছিল। চার মাসে চার বোতল। এক বোতল তেল তৈরি করতে এক মাস সময় লাগে। প্রথম মাসের পাঠানো তেল আমি হাতে পেয়ে নিজেই ব্যবহার করেছি। সেটার ফলাফল নিজের চোখেই দেখেছেন। সেই জোরেই ব্যবসা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শুরুই তো করতে পারিনি। পরের তিন মাসে আসা তিন বোতল তেল হাপিস।'

'তেল খুঁজে বের করতে হলে আগে তেলচোরকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'ঠিক। কান টানলে মাথা আসবেই।'

গোয়েন্দা বললেন, 'আমার দুটো জিনিস চাই। কুরিয়ারের ঠিকানা আর তেলের বোতল। বোতল আপনি ফেরত পাবেন। তারপর দেখি কোথাকার তেল কোথায় গড়ায়।'

২.

সাত দিন পর সেই এক আসনের একমাত্র সোফায় বসতে বসতে আবদুল হাই জানতে চাইলেন, 'কাজ কিছু এগোল?'

সেই দুই আসনের সোফায় বসতে বসতে গোয়েন্দা শামসু বললেন, 'অনেকখানি। সন্দেহের তালিকায় তিনজনকে জমায়েত করতে পেরেছি।'

'কোন তিনজন?'

'কুরিয়ারে বুকিং দেওয়া জিনিসপত্র ঠিকঠাকমতো এসেছে কি না, চালান রসিদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন আলী হায়দার। এই মিলিয়ে দেখার সময় কার্টন খুলে বোতল থেকে তেল হাপিস করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়।'

'বাহ! এরপর?'

'জমির উদ্দিন। কোন জিনিস কখন কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে, ডেলিভারিম্যানদের সেটা তিনিই ঠিক করে দেন। আপনি কি নির্দিষ্ট দিনে হোম ডেলিভারি পেয়েছিলেন?'

'নির্দিষ্ট দিনেই পেয়েছি, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে পাইনি। কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়েছিল।'

'সন্দেহের তালিকায় জমির সাহেবও আছেন।'

'গুড। আর তৃতীয় সন্দেহভাজন?'

'ডেলিভারিম্যান জয়নাল। এ এলাকার ডেলিভারিগুলো সে-ই করে।'

'কিন্তু প্রমাণ?'

> আধারের জন্য আমার এক কেমিস্ট বন্ধুর সাহায্য নিয়েছি। তেলের সঙ্গে সে এমন কিছু মিশিয়েছে, ওই তেল মাথায় মাখামাত্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

শামসু বললেন, 'প্রমাণ করতে হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এ জন্য কুরিয়ার অফিসে আগে অভিযোগ জানাতে হবে।'

আঁতকে উঠলেন আবদুল হাই। 'না, না। সেটা অসম্ভব। অভিযোগ করলেই খোঁজখবর শুরু হয়ে যাবে। তেলের উৎসটাও আর গোপন থাকবে না।'

হতাশ হলেন গোয়েন্দা। 'তাহলে আপনি কী করতে চান?'

'প্রতিশোধ নিতে চাই এবং এমনভাবে নিতে চাই, যাতে তেলচোরেরা ঠিকই বুঝবে কে প্রতিশোধ নিয়েছে, কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না।'

'মানে আপনার এখন যে রকম অবস্থা, তাদেরও ঠিক একই অবস্থা করতে চাইছেন। তাই তো?'

চোয়াল কঠিন করে আবদুল হাই বললেন, 'তার চেয়ে কঠিন। চুরি হওয়া তেল উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আমার ৯ লাখ টাকা গচ্চা। কঠিন প্রতিশোধ নিয়ে সেটা পুষিয়ে দিতে হবে। কঠিন প্রতিশোধ নিতে পারবেন তো?'

গম্ভীর কণ্ঠে শামসু বললেন, 'বড়শি তো পেতেই রেখেছি। আপনি যেখান থেকে তেল আনিয়ে থাকেন, সেখানে তেলের বোতলটা পাঠিয়েছেন তো?'

'দুদিন আগেই এবং আপনার কথামতো জানিয়েও দিয়েছি যেন এই বোতলই আবার আমার ঠিকানায় একই কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেয়।'

'দারুণ! বড়শিতে শিকার ধরা পড়তে দেরি নেই। দু-তিন দিনের ভেতর প্রমাণসহ চোরের হদিস পেয়ে যাবেন।'

হতাশ কণ্ঠে আবদুল হাই বললেন, 'কিন্তু প্রতিশোধ!'
গোয়েন্দা বললেন, 'প্রমাণটাই হবে প্রতিশোধ।'

৩.

আরও তিন দিন পর সদ্য ডেলিভারি পাওয়া কাগজের একটা কার্টন খুলতে লাগলেন গোয়েন্দা শামসু। খড় সরিয়ে শোলার বাক্স খুলে বোতলটা বের করে আনলেন। এক আসনের একমাত্র সোফায় বসা আবদুল হাইয়ের হাতে বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন আপনার বোতল।'

হাতে বোতল নিয়ে আবদুল হাই বললেন, 'বোতল তো দেখছি খালি। এটাই সেই বোতল তো?'

রহস্যময় হাসি দিয়ে সেই দুই আসনের সোফায় গিয়ে বসলেন গোয়েন্দা শামসু। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ। এটাই সেই বোতল। বোতলে আধার ভরে একটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম। চিহ্নটা আছে কিন্তু আধারটুকু নেই। তার মানে মাছ বড়শির আধার গিলেছে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে আবদুল হাই বললেন, 'কী আধার ছিল বোতলে?'

গোয়েন্দা শামসু বললেন, 'আধারের জন্য আমার এক কেমিস্ট বন্ধুর সাহায্য নিয়েছি। তেলের সঙ্গে সে এমন কিছু মিশিয়েছে, ওই তেল মাথায় মাখামাত্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে। ছাব্বিশ ঘণ্টা পর চুল পড়া শুরু হবে এবং মাত্র বাইশ মিনিটে মাথা খালি হয়ে যাবে।'

চোখ দুটো কপালে তুলে আবদুল হাই বললেন, 'বলেন কী! গতিটা বেশি হয়ে গেল না?'

'আপনি কঠিন প্রতিশোধ নিতে বলেছিলেন। সে কারণে গতি না বাড়িয়ে উপায় ছিল না। আর ছাব্বিশ ঘণ্টা পর আমরা ফলাফল দেখতে যাচ্ছি।'

৪.

কুরিয়ার অফিসটা বেশ বড়ই। কিন্তু বড্ড হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি। কাউন্টারে গিয়ে ম্যানেজারের খোঁজ করতেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আমিই ম্যানেজার। কিছু বলবেন?'

'আপনার সঙ্গে জরুরি আলাপ ছিল।'

মুখ ভার করে ম্যানেজার বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আজ আমি খুব ব্যস্ত। দেখতেই পাচ্ছেন হই-হট্টগোল চলছে। অনুগ্রহ করে যদি আগামীকাল...!'

পুরো কথা শেষ হওয়ার আগেই গোয়েন্দা শামসু বললেন, 'বেশ বিশৃঙ্খল অবস্থা। আজ আপনার তিনজন কর্মী কাজে আসেনি। তাই তো?'

'তিনজন নয়, চারজন। বারোজন কর্মীর মধ্যে চারজন না এলে যা হয় আরকি!'

শামসু বললেন, 'কাজে আসেনি ডেলিভারিম্যান জয়নাল, বুকিং চেকার আলী হায়দার, সুপারভাইজার জমির উদ্দিন। আরেকজন কে?'

'আমার সহকারী আইনুল।'

'হঠাৎ করে সবারই মাথার চুল পড়ে গেছে, তা-ই না?'

অবাক হয়ে গোয়েন্দা শামসুর দিকে তাকালেন ম্যানেজার। বিস্ময়ে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেছে। কপালের আরেকটু ওপরেই মাথাভরা কাঁচা-পাকা চুল। বিস্মিত কণ্ঠে ম্যানেজার জানতে চাইলেন, 'অবাক কাণ্ড! কী করে জানলেন?'

জবাব দিলেন না গোয়েন্দা শামসু। আবদুল হাইকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন কুরিয়ার অফিস থেকে।

অলংকরণ : **রেহনুমা প্রসূন**

• আয়োজন

দেশসেরাদের পুরস্কার দিয়ে শেষ বিজ্ঞান উৎসব জাতীয় পর্ব

ঢাকার সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে গত ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব। সকালেই জাতীয় সংগীত পরিবেশনা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতা, যেখানে দেশের সাত অঞ্চলের প্রায় ১৫০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পাশাপাশি চলে বিজ্ঞান প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও বিচারকার্য। দুপুরে 'সায়েন্স আনপ্লাগড' পর্বে অধ্যাপক লাফিফা জামাল, অধ্যাপক আদনান মান্নান, কার্টুনিস্ট নাসরীন সুলতানা মিতু, অধ্যাপক ফারসীম মান্নান ও অধ্যাপক আরশাদ মোমেন বিজ্ঞানভিত্তিক নানা বিষয়ের ওপর মজার আলোচনা করেন। এআই-বিষয়ক সেশনে কথা বলেন আন্তর্জাতিক এআই অলিম্পিয়াড দলের নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন।

মঞ্চে ছিল আরও নানা আকর্ষণ—রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান ম্যাজিক পরিবেশনা করেন রাজীব বসাক এবং গান পরিবেশন করেন গায়ক 'ডি রকস্টার শুভ'। চমক হিসেবে মঞ্চে আসেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাফা কবির, যিনি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন। প্রজেক্ট বিভাগে সেরাদের সেরা হয় বিএএফ শাহীন কলেজের আরীব বিন ফারুক ও সাইম ইবনে সারওয়ারের 'দ্য সল্টিং আউট' প্রজেক্ট। দ্বিতীয় হয় ব্রজমোহন স্কুলের সাইফান শাফি, আর তৃতীয় স্থান অর্জন করে সেন্ট যোসেফের রায়িন আর রাদ। কুইজে মাধ্যমিক বিভাগে রংপুর জিলা স্কুলের মো. ফাহিম ফয়সাল ও নিম্নমাধ্যমিকে পারমাণবিক শক্তি গবেষণা স্কুলের ইরাম মাহমুদ রুহান প্রথম হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আশরাফুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুগত আহমেদ, চিকিৎসক ও লেখক তানজিনা হোসেন। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ল্যাপটপ, ট্যাব, বই, সনদ, মেডেল ও ট্রফি। সহযোগিতায় ছিল ড্যান কেক, পোলার, অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স, অনুপম প্রকাশনী ও গুফি। ফটোসেশন, আনন্দ আর করতালির মধ্য দিয়ে সূর্যাস্তের সঙ্গে পর্দা নামে দিনব্যাপী এ বিজ্ঞান উৎসবের।

কিআ প্রতিবেদক

WALTON | AFA
Official Regional Partner

AWARDED Superbrands BANGLADESH'S CHOICE 2025-26

WALTON
Smart Fridge

ওয়ালটন সাইড বাই সাইড ফ্রিজ

স্টাইলে ফিচারে নেক্সট লেভেলে!

স্টাইলিশ স্লিক ডিজাইন, অ্যাসথেটিক লুক ও অ্যাডভান্সড ফিচার্সসহ ওয়ালটন সাইড বাই সাইড ফ্রিজ শুধু ঘরে না, লাইফেও আপনাকে এগিয়ে রাখবে নেক্সট লেভেলে।

MSO+ INVERTER | METAL E DUO COOLING+ | 8 IN 1 CONVERTIBLE MODE | SMART APP CONTROL

waltonbd.com | 08000016267 (Toll Free) 16267

গল্প

বিকল্পী

রাফাত শামস

আমি হতাশ চোখে সারি সারি সুন্দরীর দিকে তাকলাম।

এই অনিন্দ্যসুন্দর আকৃতিগুলো আদতে মানুষ নয়, রোবট। সবার বিশেষ ফটোসেলের চোখগুলো বর্তমানে নির্জীব হয়ে আছে। তাদের চালু করলে অবশ্য সেখানে জীবনের সঞ্চার হয়। চপলতা, দুষ্টুমি, কৌতুক বা অভিমান—সব ধরনের আবেগ সেখানে খেলা করে। বিজ্ঞান অন্তত এই পর্যন্ত এসেছে।

আমি বর্তমানে এই রোবট তৈরির কোম্পানিতে কাজ করছি। বছরখানেক হয়েছে এখানে যোগ দেওয়ার পর। সত্যি বলতে, আমার নিজের কাজ খারাপ লাগে না। সামান্য একঘেয়েমি চলে এসেছে বটে। তবে আমার কর্মক্ষেত্রের মানুষজন, এখান থেকে প্রাপ্ত অর্থকড়ি ও অন্যান্য সুবিধায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলা যায়।

মাঝেমধ্যে অবশ্য কাজের চাপ একদম তুঙ্গে উঠে যায়। এই যেমন এখন।

এই সারি সারি রোবট কিন্তু বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, ফেরত এসেছে ওয়ারেন্টি-সংক্রান্ত কারণে। তাদের মধ্যে একটা উদ্ভট সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এই নিয়ে আজ সারা দিন মিটিং-কনফারেন্স করে একদম নাজেহাল অবস্থা আমার। সভা বসেছিল অন্য বিভাগগুলোর সঙ্গে। এ রকম দামি, অভিজাত, মানুষসদৃশ রোবট তৈরির বেশ অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে। একটা বিভাগ মানুষের ত্বকের কাছাকাছি পলিমারের ব্যবস্থা করে। সেটা দেখা ও ছোঁয়ার সময় প্রায় ফারাক করা যায় না আর দশটা মানুষের চামড়ার সঙ্গে।

এই বিশেষ পলিমার অন্য এক কোম্পানি প্রস্তুত করে থাকে, আমরা তাদের কাছ থেকে কিনি। নানা আইনি জটিলতা আছে এই প্রক্রিয়ায়। আজ সেই কোম্পানির দুজন প্রতিনিধিও ছিলেন সভায়। চামড়া ছাড়া আরও ছিল তড়িৎকৌশল, যন্ত্রকৌশল, জীবকৌশল ইত্যাদি বিভাগের প্রতিনিধিরা। মোট সত্তরটা বিভাগে বিভক্ত আমরা, সবাই-ই ছিলাম।

চুলচেরা বিশ্লেষণ চলল, কেন রোবটগুলোর মধ্যে ত্রুটির আবির্ভাব? যদিও বাহ্যিক কোনো সমস্যা ধরা পড়েনি, তবু কাঠামো তৈরির সঙ্গে জড়িত প্রতিনিধিরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সবার আগে তাঁদের ছুটি হলো। কাঠামোগত কোনো সমস্যা নেই। রোবটের ত্বকের পেলবতা, রং, চাকচিক্য, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা—সব ঠিক আছে।

সমস্যাটা দেখা দিতে পারে সম্ভাব্য দুই জায়গায়; কোনো একটা ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশে সমস্যা অথবা প্রোগ্রামিংয়ের গলদ।

প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যেও আবার ফারাক আছে। এখানে আবার সভার সবাই প্রায় একত্রে ভ্রুকুটিসহ তাকিয়েছিল আমার দিকে। কারণ, আবেগের প্রোগ্রামিং করার দায়িত্ব আমার বিভাগের ওপর ন্যস্ত।

মিটিং শেষ করে আমি এসেছি সেলস ডিপার্টমেন্টে। এখানে ফেরত আসা রোবটগুলো সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এখান থেকে কয়েকটি নমুনা নিয়ে চলে যাব আমার বিভাগে। দুটো নির্বাচন করলাম। বিশেষ একটা যানে তোলা হলো সেগুলো। আমি উঠে বসলাম প্যাসেঞ্জার কেবিনে। নিঃশব্দে আমার বিভাগের দিকে চলতে শুরু করল যান।

আমি ও আমার দলের অন্যরা শত চেষ্টা চালিয়েও কোনো ত্রুটি বের করতে পারলাম না। কালঘাম ছুটে যাওয়া বোধ হয় একেই বলে। সব ঠিক আছে, রোবটের ব্যবহারাদি এমনটা হওয়ার কোনো কারণই নেই।

ওহ, বলতে ভুলে গেছি মূল সমস্যাটা।

তার আগে এসব রোবট কী উদ্দেশ্যে তৈরি হয়, সেদিকে আলোকপাত করি। এরা মূলত বিকল্প ব্যবস্থা। এর প্রবর্তন হয়েছিল আরও প্রায় ত্রিশ বছর আগে। এ ধরনের রোবটের একটা সুন্দর নামও আছে, বিকল্পী।

বিকল্পী প্রজেক্ট আমাদের কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ডিওর মাথায় আসে তাঁর স্ত্রীর অপমৃত্যুর পর। গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন তিনি। অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক প্রকল্প চালাচ্ছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবার। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন, সন্তানের তিন বছর বয়সে আন্তগ্রহ ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর স্ত্রী গত হন।

দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন ডিও। সন্তানকে মায়ের অভাব ভুলিয়ে রাখতে পরিবারের কেউ কোনো ত্রুটি রাখল না। তবু মহামতি ডিওর মন মানল না। 'মা চলে আসবে, আসছে' ধরনের মিথ্যা আশ্বাস তিনি আর দিতে পারছিলেন না শিশুটিকে।

সেখান থেকেই বিকল্পীর যাত্রা শুরু। ছেলেকে মায়ের অভাব ভোলানো এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এখানে পরিবারের সমর্থনও পেয়েছিলেন ডিও। সমন্বিত হয়েছিল বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীরা।

তাঁদের সফল নিবেদন ছিল প্রথম বিকল্পী, বি ১। মহামতি ডিওর স্ত্রীর আদলে তৈরি। তাঁর মতোই কথাবার্তা, চালচলন, হাসি আর কান্না। এমনকি কণ্ঠস্বরটাও একই রকম। ভদ্রমহিলার গোটা জীবনের স্মৃতি উদ্ধার করতে অনেক হ্যাপা পোহাতে হয়েছিল মহামতি ডিওকে।

সেই বি ১-এর কাছেই মানুষ হয়েছে মহামতি ডিওর ছেলে জিম। বর্তমানে তিনি কোম্পানিতে ডিরেক্টর পদে আছেন।

চারদিকে হইচই ফেলে দিয়েছিল বি ১। অন্যান্য গ্রহ থেকেও সাংবাদিকেরা এসে ভিড় জমাতে লাগল। লম্বা লম্বা টক শো হলো। কেউ এই বিকল্পীর ঘোর বিরোধী, তো কেউ পক্ষে। হাজার রকম আইনি জটিলতা তৈরি হলো। তখন একটা প্রশ্নকে বেশ খেলো মনে হয়েছিল, এ রকম মানুষসদৃশ রোবট যদি একদিন মানুষের জায়গা দখল করে নেয়?

তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। হাজার বছর আগের সব বস্তাপচা সায়েন্স ফিকশন ছায়াছবি দেখে এসব প্রশ্নকারীর মতিভ্রম হয়েছে। এত সহজ নাকি সব? প্রতিটা কোডের লাইন তৈরি করা হয় নিবিড় যত্নে। প্রতিটা অঙ্গ-নাটবল্টু বানানো হয় কঠোর অবস্থায়। এর মধ্যে রোবটরা ঘোঁট পাকিয়ে বিদ্রোহ করে ফেলবে? বললেই হলো?

আমি এখনো মনে করি না এই 'রোবট বিদ্রোহ' হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। তবে আমাদের বিকল্পীতে হওয়া সমস্যাটা আমার কপালে কিছু চিন্তার রেখা ফুটিয়েছে।

সমস্যাটা সবার আগে ধরা পড়ে একটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টে। আমাদের বিকল্পীর একদম সর্বশেষ মডেলের একটি নমুনা স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছিল। বিকল্পীরা গাড়ি চালানোর ব্যাপারে খুব দক্ষ। এমনকি যদি কোনো দুর্ঘটনার কবলেও পড়ে, ওদের প্রথম কাজ হয় সঙ্গে থাকা মানুষদের রক্ষা করা। সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায় শিশুরা। বিকল্পীর সঙ্গে শিশুদের ভিন্ন এক বন্ধন তৈরি হয়। একবার এক বিকল্পী নিজের দেহের বেশ খানিকটা ক্ষতি করে অগ্নিকাণ্ড থেকে তার মালিকের সন্তানকে বাঁচিয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল সেই খবর। আমাদের কোম্পানির স্টকের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছিল। সেই বিকল্পীর নাম ছিল দ্বীপা। রাতারাতি দ্বীপার নামে ফ্যানপেজ খুলে যায়, জুটে যায় লাখ লাখ অনুসারী। আমাদের কোম্পানি বিনা মূল্যে দ্বীপাকে মেরামত করে দিয়েছিল।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। অভিযুক্ত বিকল্পী বাড়িতে ফেরার পথে আচমকা মাঝরাস্তায় গাড়ির গতি কমিয়ে

দেয়। রাস্তার এক পাশে গাড়ি রেখে নেমে যায় সে। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সড়কের এক প্রান্তের দিকে।

সঙ্গে থাকা শিশুটা ভয় পেয়ে যায়। বিকল্পীকে কয়েকবার ডাকে। সাড়া দেয় রোবট। আবার গাড়িতে উঠে বসে, এরপর বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যায় বাড়িতে।

এর পর থেকে সেই বিকল্পীর মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন আসে। তাকে প্রশ্ন করলে উত্তর আসতে সময় নিতে থাকে। চোখে ফুটে ওঠে রাজ্যের বিষণ্নতা। বিকল্পীদের মেজাজের একটা মিটার থাকে ব্যবহারকারীদের কাছে। সেখানেও জ্বলে আছে লাল আলো। বিকল্পী বিষণ্ন হয়ে আছে।

এ রকম আরও অভিযোগ আসতে থাকে। কারও বিকল্পী শপিং মলে আচমকা ব্রেক কষেছে, তো কারওটা সুইমিংপুলে। সৌভাগ্যবশত এখন পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এত বিষণ্নতার মধ্যেও তারা তাদের সঙ্গে থাকা শিশুর প্রতি কোনো অবহেলা দেখায়নি।

তবে এ রকম দামি রোবটের জন্য এই ত্রুটিও অনেক। এতক্ষণে চাউর হয়ে গেছে খবরটা। 'অনুভূতিবিহীন রোবট'-এর পক্ষের লোকজন আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ তো আমাদের একদম মুণ্ডুপাত করছে।

অফিসে সুরাহা করতে পারলাম না কোনো। সব ঠিক আছে। সব ধরনের কোড ঠিক আছে। কীভাবে সাড়া দেবে, কীভাবে কাজ করবে, কাকে অগ্রাধিকার দেবে—সব একদম ঠিকঠাক। কয়েকবার সিমুলেশন চালানো হলো। কোনো ভুল ধরা পড়ল না।

'ডক্টর?'

নিবিষ্টমনে তাকিয়ে ছিলাম স্ক্রিনের দিকে। একের পর এক কোড দেখছিলাম। টিনার কণ্ঠ শুনে মুখ তুলে তাকালাম। টিনা আমার অধস্তন। বিজ্ঞানবিশেষজ্ঞ। রোগা-পটকা মেয়ে, কাজপাগল। তীক্ষ্ণ নীল চোখ তার।

'কিছু পেলে?'

'না, ডক্টর। সব কোড একদম ঠিক আছে। কোথাও কোনো সমস্যা পাচ্ছি না।'

'সমস্যা না থাকলে তো এ রকম মন খারাপ করে বসে থাকার কথা নয় রোবটগুলোর, তাই না?' চড়া গলায় বলে বসলাম। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। টিনার তো কোনো দোষ নেই। কাজে বেশ তুখোড় মেয়েটা। এই দুর্যোগের সময় খামাখা ধমক খেলে বরং কাজের স্পৃহা আরও হারিয়ে ফেলতে পারে।

'দুঃখিত। তোমার ওপর ওভাবে খেঁকিয়ে ওঠা ঠিক হয়নি আমার।' অনুশোচনা ভরা কণ্ঠে টিনাকে বললাম আমি।

'না, না। আমি কিছু মনে করিনি। আপনি প্রচণ্ড চাপে আছেন।'

'চাপে থাকি আর যা-ই থাকি, সেটা দুর্ব্যবহার করার কৈফিয়ত হতে পারে না।' বলে মৃদু হাসলাম। টিনাও হাসল। আড়মোড়া ভেঙে চুলে আঙুল চালালাম। আচমকা একটা ব্যাপার মনে হলো।

'আচ্ছা টিনা, চাপে থাকলে বিকল্পীরা কীভাবে কাজ করবে, সেই কোডগুলো দেখেছ?'

প্রশ্নটা করেই বুঝলাম, বোকার মতো কিছু বলে ফেলেছি। যদিও বিচিত্র ব্যবহার করার সময় কোনো বিকল্পীই চাপে ছিল না। তাদের এই আচমকা আনমনা হয়ে যাওয়াটা হয়েছে একদম দৈনন্দিক কোনো কাজের ফাঁকেই। তবু বেশ কয়েকবার এই মানসিক চাপের অংশটা দেখা হয়েছে। আমি দেখেছি, টিনা দেখেছে। অন্যরাও দেখেছে। বলা বাহুল্য, কিছুই পাওয়া যায়নি।

টিনা অবশ্য কোনো বিরক্তি বা অভক্তি প্রদর্শন করল না। হাসিমুখে বলল, 'হয়েছে, ডক্টর। আপনি বাড়িতে যাবেন না?'

সহসা স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে চারপাশে তাকালাম। বর্তমানে কোডের একটি টার্মিনালে বসে আছি আমি। আশপাশের টার্মিনালগুলো ফাঁকা। সবাই ক্লান্ত দেহে একে একে অফিস ত্যাগ করেছে। যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছে অবশ্য। অমনোযোগীভাবে মাথা নেড়ে তাদের সবাইকে বিদায়ও জানিয়েছি। এরপর কাজের মধ্যে থাকতে থাকতে ভুলে গেছি বেমালুম।

টিনা রয়ে গেছে।

'তুমি যাও। আমি আর কিছুক্ষণ দেখব।'

টিনা কথা বাড়াল না। উচ্চতর কর্মকর্তার আদেশ বিনা বাক্যে মেনে নিল। ব্যাগ গুছিয়ে, বিদায় নিয়ে, ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল বিশাল কামরাটা থেকে।

আমি একবার দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালাম। সুবিশাল, জনশূন্য ঘরটাকে ভুতুড়ে লাগল আমার কাছে। আবার ধপ করে বসে পড়লাম।

মাথা কাজ করতে চাচ্ছে না। সারা দিনের ধকল যেন একসঙ্গে পেয়ে বসল আমাকে।

কড়া এক কাপ চা নিয়ে নিলাম মেশিন থেকে। এবার আর টার্মিনালে গেলাম না, বিশাল হলঘরের একদম শেষ মাথায় নিজের অফিস কামরায় গিয়ে ঢুকলাম। চায়ে একটা চুমুক দেওয়ার পর একটু চাঙা লাগল। মাথার ভেতর পোকার মতো গুঁতাচ্ছে। কেন এই উদ্ভট ব্যবহার?

দুবার তুড়ি দিয়ে আমার সামনে উদয় হলো একটি ভার্চুয়াল বোর্ডের। সেখানে একে একে লিখতে লাগলাম যা যা জানি।

কর্তব্য পালনে গাফিলতি নেই।

যান্ত্রিক/শারীরিক কোনো সমস্যা নেই।

কণ্ঠস্বরে বিষাদ ভর করে।

অন্যমনস্কতা শুরু হয়।

সবকিছু টুকে রেখে পাশে একটা বিশাল বৃত্ত আঁকলাম। তার মধ্যে লিখলাম : মূল সমস্যা।

রোবট কেন আনমনা হবে? এমন কোনো কোড তো কোথাও দেখলাম না! কিছু কোড নতুন করে লেখা হয়েছে। তবু সমস্যা যায়নি।

এই সমস্যার সমাধান করতে হলে একদম গভীরে যেতে হবে। একদম মূলে।

সহসা মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল।

দুদ্দার করে দৌড়ে বের হলাম। ছুটে গেলাম টার্মিনালে। লগইন করলাম শক্তিশালী কম্পিউটারে।

বিশেষ একটা ফাইলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আচরণ বিভাগের প্রধান হওয়ায় প্রায় সব ফোল্ডারে আমার আসা-যাওয়া করার অনুমতি আছে। কোম্পানির অনেক অধস্তন এসব ফোল্ডারে ঢুকতে পারে না।

তবে আমার নাগালের বাইরেও কিছু ফোল্ডার আছে। সেটা বুঝলাম সার্ভারের বিশেষ একটা ফোল্ডারে ঢুকতে গিয়ে।

দু-তিনবার চেষ্টা করার পরও গোটা গোটা অক্ষরে স্ক্রিনে ফুটে উঠল যে আমাকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

আমার ফোনটা বেজে উঠল। কোম্পানির নিরাপত্তাবিষয়ক বিভাগ থেকে ফোন। এক কর্মকর্তা গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ওই বিশেষ ফোল্ডারে আমি ঢোকার চেষ্টা করছি কি না।

অস্বীকার করার জো নেই। করলামও না।

'আমি মহামতি ডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।'

নিরাপত্তা কর্মকর্তা চমকে উঠল। এই অনুরোধ সে আশা করেনি, বলা বাহুল্য।

'আমি জানি, এই ক্ষমতা আপনার নেই। আমি নিজেও কোম্পানিতে চাকরি করি। আমি জানি, নিরাপত্তা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার এখতিয়ার আছে যেকোনো অবস্থায় মহামতি ডিওর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার। আপনি দয়া করে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিন।'

'প্রধান কর্মকর্তা একমাত্র জরুরি অবস্থায় যোগাযোগ করতে পারেন...'

'এটা জরুরি অবস্থাই।' কিছুটা চড়া গলায় বললাম আমি। 'দেখুন, প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু যদি কাজটা আপনি না করেন, তাহলে কোম্পানির যে ক্ষতি থাকে, তার জন্য কিন্তু আপনাকে দায়ী করা হবে।'

এবার বেচারা মানল। বলা বাহুল্য, নম্র-ভদ্র বৈজ্ঞানিক কারও কাছ থেকে এ রকম শক্তপোক্ত কথা আশা করেনি।

যোগাযোগ হলো প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে। ভদ্রলোক বাড়িতে ছিল এবং আমার ফোন পেয়ে মোটেও খুশি হয়নি।

তবে সে আমার অনুরোধ রাখল।

আমি যথেষ্ট উচ্চ পদে আছি কোম্পানিতে। তারপরও একদম সরাসরি ফোনে মহামতি ডিওর সঙ্গে আমার এই প্রথম কথা বলা। ত্রিশ সেকেন্ড কথা হলো।

সেখান থেকে চোখ কপালে তোলার মতো এক ঘটনা ঘটল।

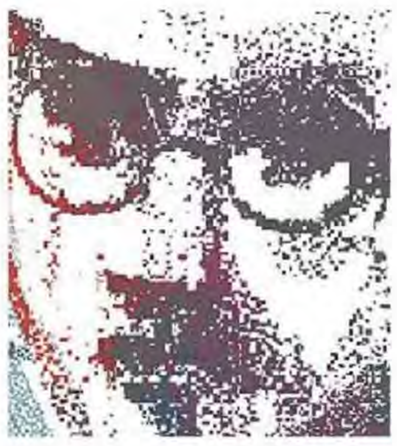

পাঁচ মিনিট পর অফিস ভবনের সামনে একটা বিশাল কালো গাড়ি এল। সেই গাড়ি আমাকে নিয়ে ছুটল মহামান্য ডিওর বাসভবনের দিকে।

মহামান্য ডিওকে আমি আবিষ্কার করলাম একটা গোলাকার বসার ঘরে। আসবাবের কোনো আধিক্য নেই। তবে যা আছে, সেসব অত্যন্ত রুচিশীল, দামি ও আরামদায়ক।

মহামতি ডিওকে দেখলে তাঁর বয়স বোঝা যায় না। ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ঘরে ঢোকার পর আমাকে স্পষ্টকণ্ঠে বসতে বললেন।

'আপনার ওপর দিয়ে বেশ ধকল গেছে বুঝলাম, ডক্টর শামস।' স্মিত হেসে, মৃদু কণ্ঠে বললেন ডিও।

'না, স্যার। তেমন কিছু নয়।'

'বিনয়ের প্রয়োজন নেই।' হালকা মাথা দুলিয়ে বললেন ডিও, 'চা খাবেন? আমি খুব খুশি হব, যদি...।'

'জ... জি। ঠিক আছে।'

চা এল। চায়ের সঙ্গে এল মুচমুচে একধরনের পেস্ট্রি। খেয়ে চমকে উঠলাম। এ রকম স্বাদু খাবার অনেক দিন খাইনি।

'পেস্ট্রি আরও কিছু নেবেন?' মোলায়েম কণ্ঠে বললেন মহামতি ডিও।

'ন...না। থাক। স্যার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'সে বুঝতে পেরেছি। বলুন কী বলবেন।'

লম্বা একটা দম নিলাম। এরপর বলা শুরু করলাম, 'আমাদের এই নতুন মডেলের বিকল্পীতে কোনো খুঁত নেই। একগাদা মেধাবী, তুখোড় মানুষ আজ সারা দিন এই অস্তিত্ববিহীন খুঁত খুঁজে পায়নি।'

'খুঁত না থাকলে এই আনমনা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আমি যদ্দুর বুঝতে পারছি, আপনার কাছে একটা ব্যাখ্যা আছে।'

'আছে।' সামান্য হেসে বললাম, 'ব্যাখ্যা আছে। এই আনমনা হওয়ার ব্যাপারটা আসলে কোডের ভুলের জন্য নয়। এটা একটা অব্যক্ত অনুভূতির ছাপ।'

'বলে যান।'

'স্যার, বিকল্পীর মতো এ রকম যুগান্তকারী আবিষ্কারের খুঁটিনাটি একান্ত গোপনীয় বিষয়। সেটা আমরা জানি। আমি নিজেও শত পাতার ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্টে সই করেছি। কিন্তু আমিও কিছু বিষয় জানি না। না জানলেও, আঁচ করতে পারি।'

মহামতি ডিও কিছু বললেন না।

'আপনার প্রথম বিকল্পীকে তৈরি করেছিলেন ম্যাডামের আদলে। ব্যবহার করেছিলেন ম্যাডামের স্মৃতি। অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়েছে মৃত মানুষের স্মৃতি আহরণে। এরপরে বিকল্পী প্রজেক্ট অনেক এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রতিটি বিকল্পীর মধ্যে ছাপ রয়ে গেল একেকজন ম্যাডামের। প্রযুক্তি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডামের অন্য আঙ্গিকগুলোও শিখে নিতে লাগল ডিপ মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে...'

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন ডিও।

'তো এই বিকল্পীরা এমন কিছু দেখেই আনমনা হচ্ছে যা দেখে জিনিয়া আনমনা হতো, তা-ই তো?'

ম্যাডামের নাম যে জিনিয়া, ভুলে গিয়েছিলাম। এক

নিবিষ্টমনে তাকিয়ে ছিলাম স্ক্রিনের দিকে। একের পর এক কোড দেখছিলাম। টিনার কণ্ঠ শুনে মুখ তুলে তাকালাম। টিনা আমার অধস্তন। বিজ্ঞানবিশেষজ্ঞ। রোগা-পটকা মেয়ে, কাজপাগল। তীক্ষ্ণ নীল চোখ তার

সেকেন্ড পর বুঝলাম।

'জি, স্যার। এখন যদি ম্যাডামের স্মৃতির অ্যাকসেস পাই, তাহলে খুঁজে বের করবই, স্যার...'

আবার আমাকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন মহামতি ডিও, মুখে বিষণ্ন হাসি। চোখ বুজে কী যেন ভাবলেন, তারপর হাতের ইশারায় শূন্যে ফুটিয়ে তুললেন একটি ছবি। হাসপাতালের ছবি, সদ্য ভূমিষ্ঠ একটি শিশুর।

'স্যার, এটা কি আমাদের ডিরেক্টর স্যার?'

'না। এটা ওর বড় ভাই, জিও।' নিচু কণ্ঠে বললেন ডিও।

'বড় ভাই...' বিস্মিত কণ্ঠে বললাম আমি।

'হ্যাঁ। একে আপনারা দেখেননি। কারণ, জন্মের কয়েক মাস পরই মারা যায় ও। নিউমোনিয়া। প্রাগৈতিহাসিক রোগ। আমাদের ভাগ্যেই জোটে। সে যাক, জিওকে হারানোর বেদনা কখনোই সামলে উঠতে পারেনি জিনিয়া। নিউমোনিয়ার মতো তুচ্ছ রোগে আমার সন্তান মারা গেছে, এই খবর চাউর হতে দেয়নি আমার পরিবার। আমাদের বিরাট ওষুধের ব্যবসা। স্টকের দাম লাটে উঠবে। তাই ধামাচাপা দেওয়া হলো। জিনিয়া কখনোই মেনে নেয়নি সেটা। আমি নিশ্চিত, যদি খোঁজ নেন, দেখবেন জিওর বয়সী কোনো শিশুকে দেখেই বিকল্পীরা থমকে গেছে।'

অলংকরণ : **তনি সুভংকর**

অন্যরকম প্রজন্ম উৎসব

তুমিও হতে পারো

LAB LEGEND?

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্সের এবারের আয়োজনের নাম ছিল "ল্যাব লিজেন্ড"। আমাদের এই বিশাল পৃথিবীতে এত বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার আছে, যা নিয়ে তুমি প্রশ্ন আর গবেষণা করে পুরো একটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। আমাদের অন্যরকম প্রজন্মের বন্ধুদের মধ্যে আমরা এই মাইন্ডসেটটাই তৈরি করতে চাইছি। ল্যাব লিজেন্ড ক্যাম্পেইনে আমরা চমৎকার সব এক্সপেরিমেন্টের ভিডিও পেয়েছি। সেখান থেকে চারজনকে আমরা বিজয়ী হিসেবে মনোনীত করেছি।

এবার দেখে নাও বিজয়ী চারজনের নাম

আবদুল্লাহ আল মাহদী
তৃতীয় শ্রেণি
চাইল্ডফেয়ার একাডেমী

রাউফ মুহতাদি রাফি
সপ্তম শ্রেণি
বিএএফ শাহীন হাজী আশরাফ আলী স্কুল

কুররাত আব্দুল কাহহার
দ্বিতীয় শ্রেণি
টেসল এ্যালিমেন্টারী স্কুল

অভ্র মিত্র
দ্বিতীয় শ্রেণি
দক্ষিণ দাড়িয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

চারজন পাবে পছন্দের বিজ্ঞানবাক্স উপহার!

২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীরা

অনিষা

অভ্র

আনিসা

আফিফা

আয়াজ

আয়াত

আর্শিয়া

কাহহার

জাবীর

তারতিল

নির্জনা

ফাহিম

বিনায়ক

মাহদী

মুইন

মুঈদ

মুহাম্মদ

রাফি

সাইফান

সুমাইয়া

হাওয়া

হিশাম

তুমিও যোগ দিতে পারো অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স পরিবারে।
হতে পারো অন্যরকম প্রজন্মের একজন।
অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে যোগ দিতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করো।

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

নোবেল পুরস্কার ২০২৫

যে কারণে নোবেল পেলেন তাঁরা

নোবেল পুরস্কার বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারগুলোর একটি। বিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি ও শান্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবছর দেওয়া হয় এই পুরস্কার। পুরস্কারটি শুধু ব্যক্তিগত কৃতিত্বের স্বীকৃতি নয়, বরং নতুন জ্ঞান, উদ্ভাবন ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

সংক্ষেপে, ২০২৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল দেওয়া হয়েছে কোয়ান্টামের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। রসায়নে নোবেল এসেছে নতুন ধাতব-জৈব কাঠামো আবিষ্কার করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার কারণে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সাহিত্যে নোবেল দেওয়া হয়েছে শিল্পের শক্তিকে তুলে ধরার জন্য। অর্থনীতিতে উদ্ভাবনভিত্তিক প্রবৃদ্ধি বুঝিয়ে মিলেছে নোবেল। শান্তিতে নোবেল দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সাহস দেখানোর জন্য। চলো, আরেকটু বিস্তারিত জানি।

১

পদার্থবিজ্ঞান

২০২৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন মার্কিন বিজ্ঞানী। জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ দ্যভোরে এবং জন এম মার্টিনিস পেয়েছেন এবারের নোবেল। তাঁদের কাজের মূল বিষয় হলো ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম টানেলিং এবং ইলেকট্রিক সার্কিটে শক্তির কোয়ান্টাইজেশন। সহজভাবে বলতে গেলে, এই তিন বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অদ্ভুত 'সুড়ঙ্গ প্রভাব' বা টানেলিংকে এমন বড় পরিসরে পরীক্ষা করতে পেরেছেন, যা আমাদের চোখে দৃশ্যমান।

কোয়ান্টাম জগৎ সাধারণত অত্যন্ত ক্ষুদ্র, যেমন একক ইলেকট্রন বা পরমাণু, যেখানে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলো ঘটে। তবে ক্লার্ক, দ্যভোরে ও মার্টিনিস একটি বিশেষ সুপারকন্ডাক্টর সার্কিট তৈরি করেন, যেখানে কোটি কোটি 'কুপার পেয়ার' একসঙ্গে এমন আচরণ করে, যেন একটি একক কণা। এই সার্কিটে তাঁরা দেখান, কুপার পেয়ারগুলো শূন্য ভোল্টেজ থেকে হঠাৎ ভোল্টেজ দশায় পৌঁছাতে পারে, ম্যাক্রোস্কোপিক স্কেলে টানেলিং ঘটে।

১৯৮৪-৮৫ সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে এই পরীক্ষা চালানো হয়। জোসেফসন জাংশনের মাধ্যমে তিন বিজ্ঞানী শক্তি শোষণ ও নিঃসরণের 'কোয়ান্টা' পর্যবেক্ষণ করেন। এটি ইলেকট্রনের কক্ষপথ পরিবর্তনের মতো আচরণ করে, কিন্তু দৃশ্যমান জগতে। এই গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের মতো ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম পরীক্ষা বাস্তবে করেন।

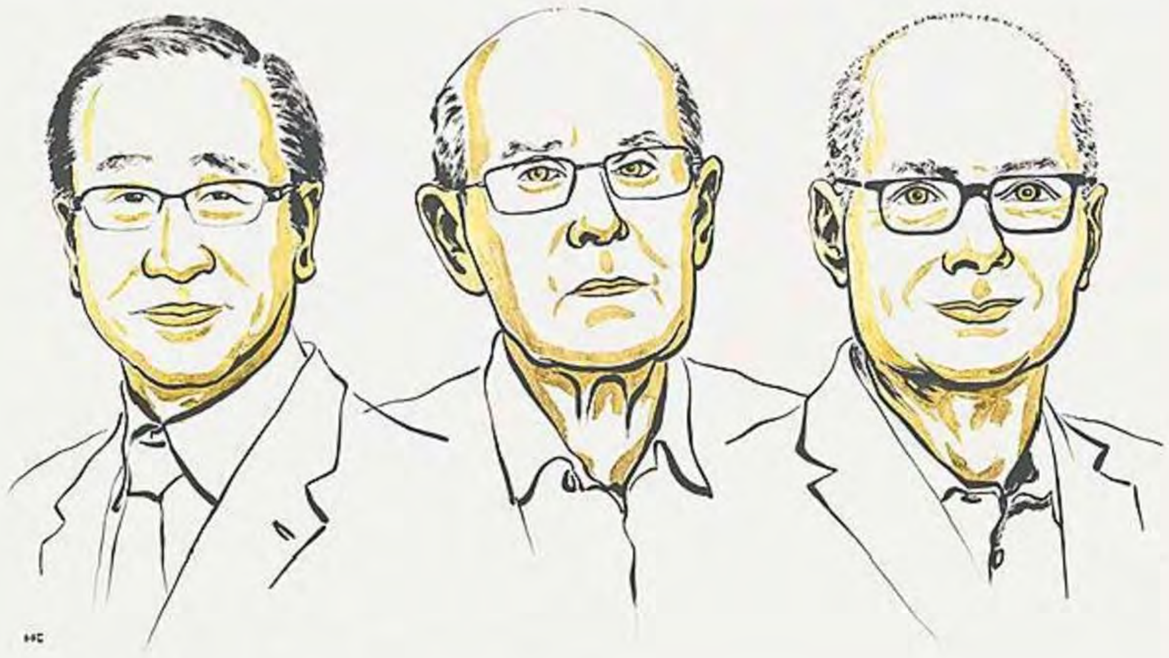

রসায়ন

২০২৫ সালে রসায়নে সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াগিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 'ধাতব-জৈব কাঠামো' আবিষ্কারের জন্য। ধাতব-জৈব কাঠামো হলো একধরনের বিশেষ আণবিক কাঠামো, যা এমনভাবে ডিজাইন করা যায় যে এর ভেতরে বিপুল গ্যাস, অণু বা অন্যান্য পদার্থ রাখা যায়। সহজভাবে বলা যায়, এটি একটি আণবিক 'বাড়ি' বা 'প্যাকেট', যার ভেতরের গহ্বরগুলো খুব বড় আণবিক মাত্রায়। এই কাঠামো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়, যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব

চলতি বছর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মেরি ব্রুঙ্কো, ফ্রেড রামসডেল ও শিমন সাকাগুচি। পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স তথা শরীরের রোগ প্রতিরোধক কোষ জীবাণুদের আক্রমণ করতে গিয়ে যেন নিজের টিস্যু বা অঙ্গকে আক্রমণ না করে, সেই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদিন আমাদের শরীর অসংখ্য জীবাণুর মাধ্যমে আক্রমণের শিকার হয়। এই আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে শরীরের অতন্দ্র প্রহরী, রোগ প্রতিরোধতন্ত্র। সহজভাবে বলা যায়, দেহের নিরাপত্তাব্যবস্থা। নানা ধরনের হাজারো জীবাণু আক্রমণ করে আমাদের। এর কোনো কোনোটি আবার আমাদের দেহের কোষের রূপও নিতে পারে। অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে। তাদের সঠিকভাবে চিনে, নিজ শরীরের কোষকে আক্রমণ না করে রোগ প্রতিরোধ করে দেহের নিরাপত্তাব্যবস্থা।

এ রহস্যের সমাধান মিলেছে এবারের চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেলজয়ীদের

গবেষণায়। মেরি ব্রুঙ্কো, ফ্রেড রামসডেল ও শিমন সাকাগুচিকে দেহের নিরাপত্তাব্যবস্থার 'প্রান্তিক সহনশীলতা'-বিষয়ক মৌলিক গবেষণার জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কথাটা শুনতে জটিল মনে হতে পারে। মূল বিষয় হলো, শরীরের নিরাপত্তাব্যবস্থার কোষগুলো নিজের টিস্যু বা অঙ্গকে আক্রমণ না করে কীভাবে জীবাণুদের সফলভাবে আক্রমণ করে, সে রহস্যই ভেদ করেছেন এই তিন বিজ্ঞানী।

সাহিত্য

২০২৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 'তাঁর সুনিশ্চিত ও দিব্যদৃষ্টিপূর্ণ সাহিত্য সম্ভারের কারণে, যা এই মহাবিপর্যয়ময় আতঙ্কের কালে শিল্পের শক্তির কথা শোনায়'।

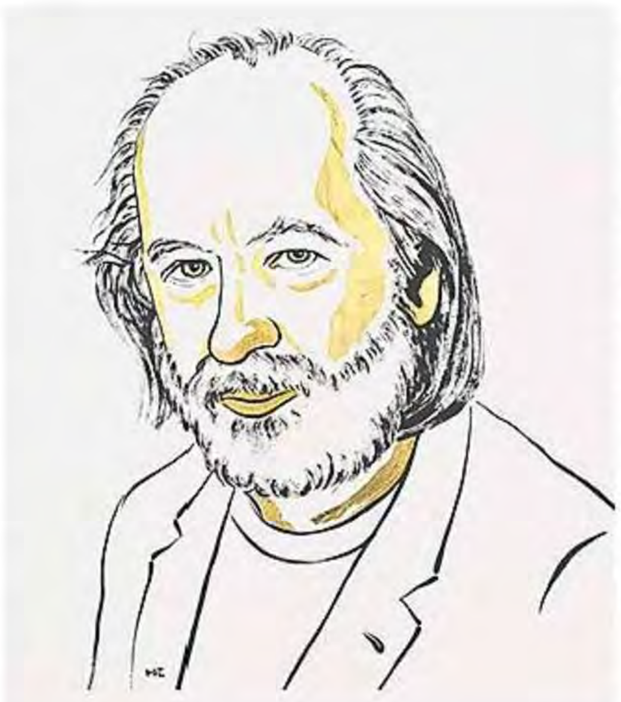

লাসলো ক্রাসনাহোরকাই ১৯৫৪ সালে রোমানিয়ার সীমান্তের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *সাতানট্যাঙ্গো* (১৯৮৫) হাঙ্গেরির একটি গ্রামীণ পরিত্যক্ত সমবায় খামারের দরিদ্র মানুষের গল্প বলে, যারা সমাজতন্ত্রের পতনের আগমুহূর্তে অনিশ্চয়তা ও নিরাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। এই উপন্যাস হাঙ্গেরির সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ক্রাসনাহোরকাইকে পরিচিতি দেয়।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের দ্বিতীয় উপন্যাস *দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স* (১৯৮৯)। তৃতীয় উপন্যাস *ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার* (১৯৯৯)। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন সাধারণ আর্কাইভ কর্মচারী, যিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে নিউইয়র্কে পাড়ি জমান। এই উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় ক্রাসনাহোরকাই লিখেছেন *ব্যারন ভেঙ্কহেইমস হোমকামিং* (২০১৬), যেখানে চরিত্রটি হাঙ্গেরিতে ফিরে শৈশবের প্রেম খুঁজতে চেষ্টা করে।

সাম্প্রতিকতম বই *হেরস্ট ০৭৭৬৯*-এর (২০২১)দৃশ্যপট পূর্ব জার্মানির থুরিঙ্গিয়ার একটি ছোট শহর। এই উপন্যাসে সমসাময়িক বাস্তবতা, সামাজিক অস্থিরতা এবং বাখ-এর সংগীত ও ঐতিহ্যের ছায়া রয়েছে। প্রধান চরিত্র বুঝতে পারে যে সে-ও সেই ধ্বংসাত্মক শক্তির অংশ, যাদের সে বিশ্বাস করেছিল। লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাফকা ও টমাস বার্নহার্ডের প্রভাব দেখা যায়।

শোষণ, দূষিত পদার্থ আলাদা করা, পানি সংগ্রহ করা, ওষুধ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি।

রবসন প্রথমে কাঠের বল ও রড দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পরমাণুর মডেল তৈরি করতে গিয়ে এ ধারণার সূত্রপাত করেন। তিনি দেখেন যে কপার আয়ন ও চার দিকের অণু ব্যবহার করে একটি সুশৃঙ্খল স্ফটিকাকার কাঠামো তৈরি করা সম্ভব, যা হীরার স্ফটিকের মতো শক্তিশালী কিন্তু ভেতরে বিশাল গহ্বরযুক্ত। কিতাগাওয়া পরে এ ধারণাকে আরও উন্নত করেন। তিনি কোবাল্ট, নিকেল ও জিংক আয়ন ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক ধাতব-জৈব কাঠামো তৈরি করেন, যার ভেতরে থাকা সুড়ঙ্গ বা গহ্বর গ্যাস ধারণ করতে সক্ষম। যদিও প্রথম তৈরি কাঠামো সরাসরি কোনো ব্যবহারিক কাজে লাগছিল না, তবে এটি আণবিক কাঠামো ডিজাইনে নতুন ধারার সূচনা করে।

ওমর ইয়াগি ধাতব-জৈব কাঠামোর নকশাটিকে আরও নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। তাঁর দল বিভিন্ন আয়ন ও জৈব অণু ব্যবহার করে বহু ধরনের ধাতব-জৈব কাঠামো তৈরি করেন। এই কাঠামোতে গ্যাস শোষণ, দূষণমুক্ত পানি তৈরি, হাইড্রোজেন সংরক্ষণ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কাজ সম্ভব হয়।

অর্থনীতি

এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন অর্থনীতিবিদ—জোয়েল মোকির, ফিলিপ আগিয়োঁ ও পিটার হাউইট। উদ্ভাবননির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁরা এ পুরস্কার পেয়েছেন।

এই তিন অর্থনীতিবিদের মধ্যে অর্ধেক পুরস্কার পেয়েছেন জোয়েল মোকির। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্তগুলো শনাক্ত করার জন্য তিনি পুরস্কার পেয়েছেন। 'সৃজনশীল বিনাশ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধির তত্ত্ব দেওয়ার জন্য বাকি অর্ধেক পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন ফিলিপ আগিয়োঁ ও পিটার হাউইট।

বিবৃতিতে নোবেল কমিটি বলেছে, নোবেলজয়ীরা আমাদের শিখিয়েছেন যে সব সময় প্রবৃদ্ধি হবে, এটা কখনোই নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় না। মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রবৃদ্ধি নয়, বরং স্থবিরতাই ছিল স্বাভাবিক অবস্থা। তাঁদের গবেষণায় দেখা গেছে, এই প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে সম্ভাব্য হুমকিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর মোকাবিলা করতে হবে।

ঐতিহাসিক উপাত্ত ও দলিল ব্যবহার করে মোকির দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও উদ্ভাবন একসময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে নিয়মিত বিষয়ে পরিণত করেছে। অন্যদিকে আগিয়োঁ ও হাউইট সেই প্রবৃদ্ধির অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ১৯৯২ সালের এক প্রবন্ধে তাঁরা গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন, যখন নতুন ও উন্নত কোনো পণ্য বাজারে আসে, তখন পুরোনো পণ্য বিক্রি করা প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে টিকে থাকতে পারে না। এই প্রক্রিয়াই অর্থনীতিতে 'সৃজনশীল বিনাশ' নামে পরিচিত। অর্থাৎ পুরোনো ব্যবস্থার ভেতর থেকেই নতুন উদ্ভাবন হয়।

শান্তি

শান্তিতে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। নরওয়ের রাজধানী অসলোর নোবেল ইনস্টিটিউট থেকে এবারের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়। নোবেল কমিটির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে নিরলস প্রচেষ্টা এবং ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণভাবে স্বৈরশাসনের উৎখাত করে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামের জন্য মাচাদোকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

ওয়েবসাইটে আরও বলা হয়েছে, এক বছর ধরে আত্মগোপনে আছেন মাচাদো। তাঁর জীবন গুরুতর হুমকির মুখে থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশেই আছেন, যা লাখ লাখ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি দেশের বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেছেন। ভেনেজুয়েলায় সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সব সময় ছিলেন অটল। নোবেল কমিটি বলেছে, স্বৈরশাসকেরা যখন ক্ষমতা দখল করেন, তখন যাঁরা স্বাধীনতা রক্ষায় সাহসী ভূমিকা রাখেন, তাঁদের চিহ্নিত করা এবং তাঁদের উদ্দীপনা ও প্রতিরোধকে স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫৮ বছর বয়সী মাচাদো শুধু রাজনীতিক নন, তিনি শিল্প প্রকৌশলীও। ভেনেজুয়েলায় ২০২৪ সালের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিকোলা মাদুরোর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন তিনি। আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে মাচাদো নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি। ফলে বিরোধীদলীয় প্রার্থী হিসেবে এদমুন্দো গোনসালেস উররুতিয়াকে সমর্থন দেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচার চালান তিনি।

তবে ওই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ব্যাপক বিরোধ দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে জয়ী ঘোষণা করে দেশটির নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। তবে বিরোধীরা এই ফলাফল নাকচ করে দেয়। ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে তারা দাবি করে যে নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী এদমুন্দো গোনসালেস জয়ী হয়েছেন। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর তা বাতিলের দাবিতে ভেনেজুয়েলাজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট মাদুরো কঠোর হাতে বিক্ষোভ দমনের পথে হাঁটেন। এতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন।

সরকারি দমন-পীড়নের মুখে বিরোধী নেতা গোনসালেস আত্মগোপনে থাকার পর দেশ ছেড়ে চলে যান। জীবনের ঝুঁকি থাকায় আত্মগোপনে যেতে হয় কোরিনা মাচাদোকেও।

কিআ প্রতিবেদক, সূত্র : *প্রথম আলো, বিজ্ঞানচিন্তা*

বুদ্ধি আর ধৈর্যের লেভেল করো আপ!

শরীরের শক্তি বাড়ার জন্যে ব্যায়াম করতে হয়, এটা আমরা সকলেই জানি। চর্চার মাধ্যমে তুমি ১০০ কেজি ওজনও তুলতে পারবে একসময়। কিন্তু বুদ্ধি বাড়ানোর জন্যে কি কোনো ব্যায়াম আছে? আছে, বেশ বিজ্ঞানসম্মত কিছু গেমই আছে। আর এরকম তিনটা দারুণ জনপ্রিয় ও পরীক্ষিত গেম তুমি পাবে বিজ্ঞানবাক্সের ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজে। এই গেমগুলির মাধ্যমে তোমার ধৈর্য ও বুদ্ধি দুটোই বাড়বে। চলো পরিচিত হওয়া যাক এই গেমগুলির সাথে।

ব্রেইন বুস্টার

৮ টা ধাতব পাজল আছে এখানে। প্রত্যেকটার জন্যে আলাদা ট্রিক। কোন দিক ধরে ঘুরাতে হবে, কোথায় আটকে আছে সব খুঁজে বের করতে গিয়ে তোমার প্রবলেম সলভিং ও ফোকাস দুটোই শার্প হবে। ধাতব পিসগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলতে খেলতে আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণ উন্নত হয়ে যাবে। ছবি আঁকা বা এই জাতীয় অন্যান্য হাতের কাজে তুমি ভবিষ্যতে অনেক সুফল পাবে।

ট্যানগ্রাম

প্রাচীন চাইনিজ গেম ট্যানগ্রাম। বুদ্ধির খেলা হিসেবে বহু বছর ধরে পরিচিত ও জনপ্রিয়। ৭ টা জ্যামিতিক শেপ দিয়ে কয়েক হাজার ডিজাইন তৈরি করা যাবে। ড্রাগন থেকে স্পোর্টস-কার, যা খুশি! একটা সমস্যার একাধিক সমাধান থাকতে পারে এই মাইন্ডসেটটাও তোমার ট্যানগ্রাম থেকেই তৈরি হবে। পাশাপাশি তোমার স্প্যাশিয়াল সেন্স উন্নত হবে এবং তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের প্রাথমিক ধারণাও পাবে।

ফোকাস চ্যালেঞ্জ

সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল করা থামাতে পারছো না? চলে তবে শুরু করা যাক মনোযোগ ধরে রাখার কোর্স! ফোকাস চ্যালেঞ্জে তুমি খেলতে পারবে ধৈর্যের খেলা! চ্যালেঞ্জটা হলো, একটা অ্যালুমিনিয়াম লুপকে একটা তারের মধ্যে দিয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যেতে হবে। তবে শর্ত হলো, তারটি স্পর্শ করা যাবে না। স্পর্শ করলেই Buzzer বেজে উঠবে। এখানে তিনটা ডিফিকাল্টি লেভেল আছে। নিজে খেলার পাশাপাশি বন্ধুদেরও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারো!

অর্ডার করতে ভিজিট করো

bigganbaksho.com

বিজ্ঞানবাক্স

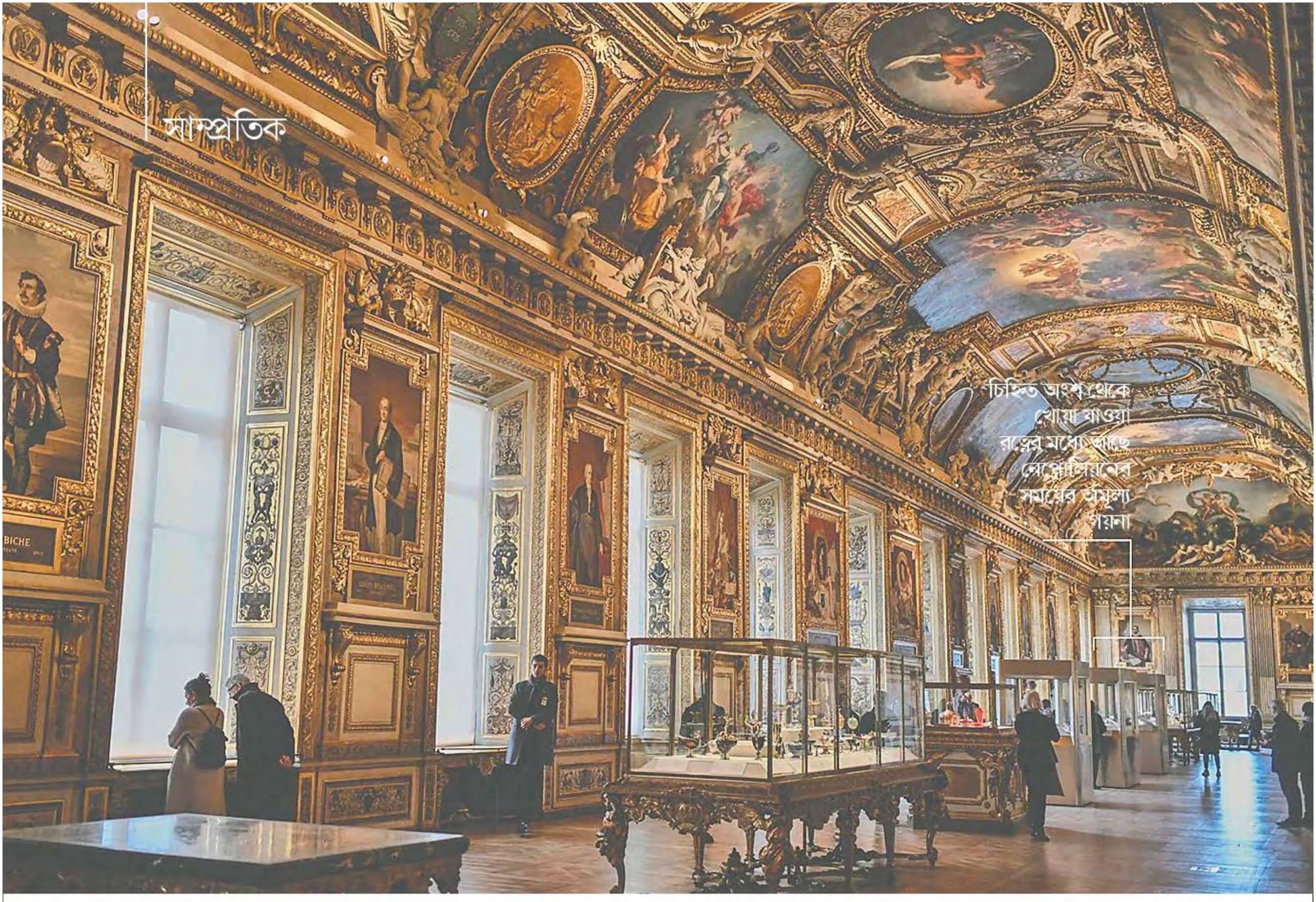

ল্যুভর মিউজিয়ামে রুদ্ধশ্বাস সাত মিনিট

আহমাদ মুদ্দাসসের

বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত মিউজিয়াম ল্যুভর। লেওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা' এই মিউজিয়ামে রাখা আছে। লাখো মানুষ প্রতিনিয়ত ল্যুভর ভ্রমণ করেন। এই মিউজিয়ামের নিরাপত্তাব্যবস্থা খুব কঠোর বলেই এত দিন লোকে জানত। তবে এই জানায় এবার বুঝি বদল এল। ল্যুভরের নিরাপত্তাব্যবস্থা যে খুব একটা শক্ত না, সেটা প্রমাণ করে ছেড়েছে পেশাদার কয়েকজন চোর।

দিনের আলোয় লোকজনের চোখের সামনে এই জাদুঘরে ঘটেছে অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। একদল পেশাদার চোর শত শত দর্শনার্থীর সামনে থেকে ফ্রান্সের রাজকীয় রত্নভান্ডারের অংশ চুরি করে পালিয়ে গেছে। খোয়া যাওয়া রত্নের মধ্যে আছে নেপোলিয়নের সময়ের অমূল্য গয়না। মাত্র সাত মিনিটের ঘটনা। চুরি করে রত্ন নিয়ে চোরেরা পালিয়েও গেছে এই সাত মিনিটে। গত ১৯ অক্টোবর ঘটে যাওয়া এ ঘটনা শুধু মিউজিয়ামের কর্তাদের না, পুরো বিশ্বের মানুষকে অবাক করেছে।

রুদ্ধশ্বাস সাত মিনিট

চুরির ঘটনাটি যেন হলিউড সিনেমার চিত্রনাট্য। মিউজিয়াম খোলে সকাল ৯টায়, তার মাত্র ৩০ মিনিট পরেই চুরি করেছে চোরেরা। একদম নিখুঁত পরিকল্পনা করে এসেছিল তারা। বোঝা যায়, ভালোই হোমওয়ার্ক করেছে। কারণ, চুরিতে তারা একদম 'সফল'।

সাড়ে নয়টার দিকে চারজন চোর এসেছে নির্মাণকর্মীদের মতো হলুদ জ্যাকেট পরে। সেন নদীর পাশে ল্যুভরের পাশের রাস্তায় একটি ট্রাক নিয়ে আসে। সেই ট্রাকে লাগানো ছিল একটি বৈদ্যুতিক বাস্কেট লিফট। এ ধরনের লিফট প্যারিসে আসবাবপত্র সরানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। রাস্তার বাতি লাগানোর জন্য সিটি করপোরেশনের লোকদের সম্ভবত এমন ট্রাক ব্যবহার করতে তুমি দেখেছ। চোরেরা ট্রাফিকের কোন নিয়ে এসেছিল। মানে গাড়ির চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক যে তিন কোনা উপকরণটি ব্যবহার করে, সেটা দিয়ে চোরেরা এমন ভান করেছে, যেন সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে।

সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে দুজন চোর মই বেয়ে দ্বিতীয় তলার বারান্দায় ওঠে। এখানে ল্যুভরের বিখ্যাত অ্যাপোলো গ্যালারি। ফ্রান্সের মুকুটের রত্নগুলো এখানে প্রদর্শিত হয়। চোরেরা গ্রাইন্ডার বা ডিস্ক কাটার ব্যবহার করে একটি জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে মিউজিয়ামের নিরাপত্তা অ্যালার্ম বেজে ওঠে। কিন্তু চোরদের থামানো যায়নি।

ভেতরে প্রবেশ করে মাত্র ৯টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে তারা দুটি সুরক্ষিত কাচের ডিসপ্লে কেস ভেঙে ফেলে এবং আটটি মূল্যবান গয়না লুট করে। এই আটটি জিনিসের মধ্যে ছিল সম্রাট নেপোলিয়ন তৃতীয়ের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী ইউজেনির মুকুট ও ব্রোচ। ছিল সম্রাজ্ঞী মারি লুইসের পান্নার হার ও কানের দুল। আরও ছিল রানি মেরি-অ্যামেলি ও হর্তসের নীলা পাথরের সেট থেকে মূল্যবান গয়না। চুরি যাওয়া গয়নাগুলোর মোট মূল্য প্রায় ১০.২ কোটি ডলারের বেশি।

মিউজিয়ামের কর্মীরা নিরাপত্তা প্রটোকল মেনে প্রথমে দর্শনার্থীদের সরিয়ে দেন এবং দ্রুত পুলিশকে খবর দেন। ৯টা ৩৮ মিনিটে চোরেরা একই জানালা দিয়ে নেমে আসে। বাইরে অপেক্ষারত সঙ্গীদের সঙ্গে স্কুটারে চড়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

চোর চলে যায়, রয়ে যায় প্রমাণ

চোরেরা পালানোর সময় তাদের ব্যবহার করা ডিস্ক কাটার, ওয়াকিটকি, গ্লাভস এবং একটি হলুদ জ্যাকেট ঘটনাস্থলে ফেলে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তারা তাদের হাতে থাকা সম্রাজ্ঞী ইউজেনির মুকুটটি বাইরে ফেলে যায়, যা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এই ফেলে যাওয়া জিনিসগুলো তদন্তকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে।

বাইরে থেকে সিঁড়ি ব্যবহার করে দোতলায় ওঠে চোর

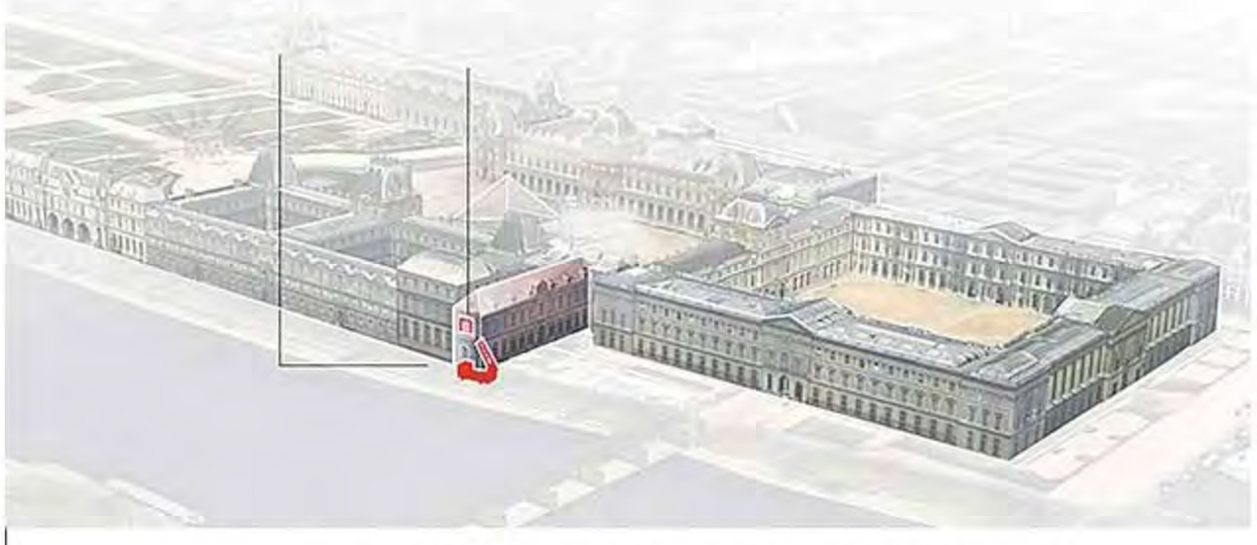

ল্যুভর মিউজিয়ামের এই অংশ থেকে চুরির ঘটনা ঘটেছে

এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তোলপাড় শুরু হলে প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ এটিকে 'ফরাসি ঐতিহ্যের ওপর আক্রমণ' বলে নিন্দা জানান। গয়না উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। প্যারিসের প্রসিকিউটরের অফিস মামলাটি হাতে নেয় এবং প্রায় ১০০ জন তদন্তকারীকে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা সিসিটিভি ফুটেজ ও ফরেনসিক নমুনা (ডিএনএ, আঙুলের ছাপ) বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন।

তদন্তের ফল হিসেবে ঘটনার এক সপ্তাহ পর, মানে ২৬ অক্টোবর ফরাসি কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, তারা এ চুরির ঘটনায় কয়েকজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্যে একজন ছিল, যে শার্ল দ্য গল বিমানবন্দর দিয়ে দেশ ছাড়ার চেষ্টা করছিল।

চোর ধরলেই সব ফিরে পাওয়া যায় না

এ চুরির ঘটনা মিউজিয়ামে আগের চুরিগুলো থেকে আলাদা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চোরেরা এখন আর সহজে চেনা যায় এমন চিত্রকর্ম চুরি করে না। যেমন মোনালিসাকে এখন সম্ভবত পাগল না হলে কেউ চুরি করবে না। কারণ, এটা বিক্রি করা কঠিন। এটা চুরি করে কোনো আর্থিক লাভ করা সম্ভব না। আর ধরা খাওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। তাই এখন চোরদের লক্ষ্য হলো গয়না, মুদ্রা বা মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি এমন জিনিস চুরি করা। এগুলো ভেঙে ফেলে বা গলিয়ে কাঁচামাল হিসেবে দ্রুত বিক্রি করে দেওয়া যায়। সোনার গয়না চুরি করে গলিয়ে ফেললেই আর জানা যায় না কী গয়না ছিল এটি। ল্যুভরে চুরির পরপরই বিশেষজ্ঞরা এই আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। চুরি যাওয়া রত্নগুলো ভেঙে ফেলা হতে পারে, এই দুশ্চিন্তাই তদন্তকারী বা গোয়েন্দাদের মূল মাথাব্যথা হয়ে ওঠে। কারণ তো বলেছিই, ভাঙা রত্ন শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব।

এই চুরি নিয়ে দুশ্চিন্তার আরও কারণ আছে। এটি ঘটেছে দিনের আলোয়। মিউজিয়ামে এ সময় দর্শনার্থীতে ভরা ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য সুরক্ষিত ভবনের চেয়ে মিউজিয়ামগুলো 'সহজ লক্ষ্য'। এমন মিউজিয়ামে ভিড়ের মধ্যে সহজে প্রবেশ করা যায়। বলপ্রয়োগ করে দ্রুত লুটে নেওয়া যায়।

নিরাপত্তাঘাটতি রয়েই গেল

চুরির পর ল্যুভর মিউজিয়ামের দুর্বল নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। মিউজিয়ামের পরিচালক স্বীকার করেন, নিরাপত্তাব্যবস্থা পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। চোরেরা যে জানালা দিয়ে ঢুকেছিল, তার বাইরের সিসিটিভি ক্যামেরাটি অন্যদিকে ঘোরানো ছিল।

এ সমালোচনার মুখে প্রেসিডেন্ট মাখোঁ ঘোষণা করেন, ল্যুভরের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ৮ কোটি ইউরো খরচ করে বড়সড় সংস্কার পরিকল্পনা আগামী বছর শুরু হবে। এ পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে উন্নত নজরদারি ক্যামেরা এবং আধুনিক নিরাপত্তাব্যবস্থা।

তিন দিন বন্ধ থাকার পর ২২ অক্টোবর ল্যুভর মিউজিয়াম আবার খুলে দেওয়া হয়। তবে চুরি যাওয়া গয়নাগুলো উদ্ধারের জন্য তদন্ত এখনো পুরোদমে চলছে (২৭ অক্টোবর)। এখন পরের খবর জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অনুসন্ধান করে গোয়েন্দারা বের করবেন, গয়নাগুলো কি ফেরত পাওয়া যাবে, নাকি এরই মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেছে? মানে, অমূল্য রত্নগুলো ভেঙে বা গলিয়ে ফেলা হয়েছে কি না, তা সময়ই বলে দেবে।

সূত্র : এপি, বিবিসি এবং সিএনএন ছবি : নিউইয়র্ক টাইমস

নিখোঁজ সময়ের অজানা আততায়ী

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

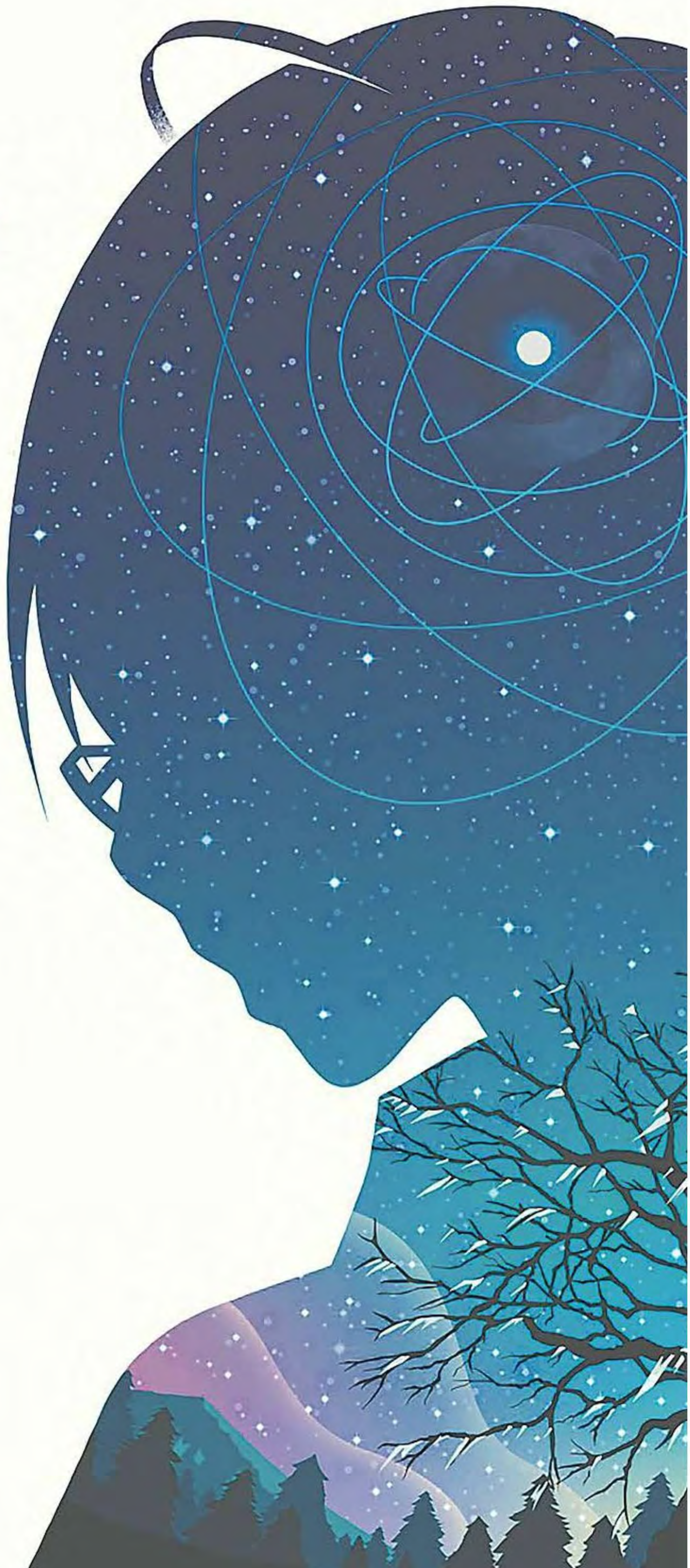

সময়ভ্রমণ কিংবা প্রচলিত কথায় যাকে বলে টাইম-ট্রাভেল; তোমাদের কি কখনো মনে হয়েছে, এমন কিছু আবিষ্কৃত হলে মন্দ হতো না? আমি বহুবার এটা নিয়ে ভেবেছি। দু-একটা গল্পও লিখেছি এ বিষয়ে। মাঝেমধ্যেই মনে হয়, আহা, যদি এমন একটা সময়ে গিয়ে থাকতে পারতাম, যেখানে পরীক্ষা নামের বিচ্ছিরি জিনিসটা আবিষ্কৃত হয়নি, কী ভালোই না হতো!

তবে জীবনের সুদীর্ঘকাল আমি অতীতে গিয়ে বিশেষ কিছু বদলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, অতীতে কিছু বদলে দিলে আজকের দিনের যে আমি থাকবে, সেটা আর সেই আমি হবে না; যে অতীত বদলাতে পাড়ি দিয়েছিল সময়ের পথে। কারণ, অতীতের প্রতিটি ঘটনা আর সিদ্ধান্তের সমষ্টিই তো আজকের আমি, আজকের তুমি। কিন্তু বয়স বাড়ে, সময় বদলায়, পাল্টায় জীবনের উপলব্ধি। আজ হয়তো কিছু কিছু জিনিস একটু বদলে দিতে আগ্রহ বোধ করি। বর্তমানের আমিটাকে আর অতটা জরুরি ও অনিবার্য বলে মনে হয় না।

যদিও আজ যে অ্যানিমে নিয়ে কথা তোমাদের জানাতে চলেছি, তার কাহিনিতে অতীত বদলের গুরুত্ব নিছক আত্মকেন্দ্রিক নয়; বরং এ চেষ্টা হয় অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য, রহস্য সমাধানের উদ্দেশ্যে। আজ অ্যানিমে-কথনের চোখ থাকবে ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত চলা জনপ্রিয় অ্যানিমে *বোকু দাকে গা ইনাই মাচি* বা *ইরেজড*-এর (*ERASED*) ওপর।

এ গল্প সাতোরু ফুজিনুমার। উনত্রিশ বছর বয়সী এক ব্যর্থ মাঙ্গাকা সে। জীবন চালাতে তাকে কাজ নিতে হয়েছে এক পিৎজাশপে। কাজটা বিশেষ কিছু কঠিন নয়, দোকানের বাইক চালিয়ে তাজা পিৎজা পৌঁছে দিতে হয় ক্রেতাদের হাতে। দোকানে তার সহকর্মীরা বেশ আন্তরিক। বিশেষ করে ম্যানেজার ও তার জুনিয়র একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম আইরি কাতাগিরি; সাতোরু ওকে পছন্দ করলেও বয়সের তফাৎ আর সহজাত সংকোচের কারণে কিছুটা দূরত্ব রাখে, সরাসরি কিছু বলতে পারে না।

একটা বিশেষ ক্ষমতা অবশ্য আছে সাতোরুর, আশপাশে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার উপক্রম হলে সময়ে কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে সে। চলে যায় দুর্ঘটনা ঘটার খানিকটা আগের কোনো মুহূর্তে। যদি ওইটুকু সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনার লক্ষণগুলো সে আবিষ্কার করতে পারে, তবে দুর্ঘটনা রুখে দেওয়ার

একটা চেষ্টা সে করে। যদিও এই ক্ষমতা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে না সাতোরু, সময়ের এই ভ্রমণ ঘটে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মে।

এমনই একদিন পিৎজা ডেলিভারির সময় সাতোরু লক্ষ করে, একটা বড় মালবাহী গাড়ি বেসামাল হয়ে চাপা দিতে চলেছে পথে থাকা এক শিশুকে। আচমকা পিছিয়ে যায় সময়। সাতোরু ফিরে আসে শিশুটিকে বাঁচাতে। গাড়ির অচেতন ড্রাইভারকে জাগাতে না পেরে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে কোনোমতে গাড়িটাকে সরিয়ে ফেলে পথ থেকে। ছেলেটি বেঁচে গেলেও আহত হয় সাতোরু, জ্ঞান হারায়।

আঘাত গুরুতর না হওয়ায় অচিরেই ঘরে ফিরে যায় সাতোরু। দেখে, সেখানে তার মা আগে থেকেই উপস্থিত। আহত ছেলের যত্ন নিতে কিছুদিনের জন্য কাজ ফেলে এখানে চলে এসেছে ভদ্রমহিলা। মায়ের সঙ্গে থাকতে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করলেও মনে মনে খুশিই হয় সাতোরু। পরদিন দুজন বাজারে যায় রান্নাবান্নার জন্য টুকিটাকি কেনাকাটা করতে। সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে সাতোরু লক্ষ করে যে সময় আবার পিছিয়ে গেছে। সুতরাং, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। নিজে থেকে ঘটনার সূত্রগুলো ধরতে না পেরে মাকে বলে, অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে জানাতে। ভদ্রমহিলা এদিক-ওদিক খুঁজে এক সন্দেহজনক লোককে দেখতে পায় এবং ধারণা করে যে একটা শিশুকে অপহরণ করতে চাইছিল লোকটা। কিন্তু, ওদের নজর থাকায় শেষ পর্যন্ত আর পেরে ওঠেনি।

নিজেদের মধ্যে এসব সন্দেহের কথা নিয়ে আলাপ না হলেও সাতোরু আর ওর মায়ের মনে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে আটকে থাকে এই ছোট্ট ঘটনা। সাতোরুর মনে পড়ে যায় ১৮ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা। সে সময় ওদের শহরে কিছু ছেলেমেয়ে খুন হয়েছিল এক আততায়ীর হাতে। ওদের বাঁচাতে না পারার আক্ষেপ সেই ছোটবেলায় বড় পীড়া দিয়েছিল ওকে। তা ছাড়া যে ছেলেটা খুনি হিসেবে ধরা পড়ে শাস্তি পেয়েছিল, তাকে ঠিক খুনি বরে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি সাতোরু। পত্রিকার পাতায় পুরোনো সেই ঘটনায় আবার চোখ বুলিয়ে নেয় সে। মনে পড়ে বিগত স্মৃতির কিছু কিছু।

ওদিকে সাতোরুর মা সাচিকো ফুজিনুমাও ভাবতে থাকে সেই অতীত ঘটনার কথা। ছেলের স্মৃতি থেকে সে সময়ের বিষাদটুকু ম্লান করতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু সাচিকোর অনুসন্ধানী মনে এত দিন পরও রয়ে গেছে প্রশ্ন। বাজার প্রাঙ্গণে সন্দেহজন লোকটাকে দেখে সে ভাবতে থাকে অবচেতনে। কয়েকটা সূত্র জুড়ে একটু মাথা খাটাতেই সে বুঝতে পারে যে অতীতের সেই আততায়ী আসলে কে ছিল। দীর্ঘদিন মনে আটকে থাকা প্রশ্নটার সমাধান হয়ে যেতেই মনে মনে সন্তুষ্ট হয় সাচিকো। বাড়ি ফিরে ছেলের জন্য রান্নার প্রস্তুতি নেবে, এমন সময় পেছন থেকে তাকে ছুরিবিদ্ধ করে অজানা আততায়ী। ছেলেকে কিছুই জানিয়ে যেতে পারে না তার মা, ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

বাড়িতে ফিরে মায়ের লাশ দেখে ঘাবড়ে যায় সাতোরু। আচমকা এক প্রতিবেশী এসে ওকে লাশের সঙ্গে দেখে ভুল বোঝে, পুলিশে খবর দেয়। ছুটে আসে পুলিশ বাহিনী। মায়ের খুনের আসামি হিসেবে তাদের সন্দেহ হয় সাতোরুকে। তারা ওকে ধরার চেষ্টা করতেই ছুটে পালায় সাতোরু। হঠাৎ সময় পিছিয়ে যায়। সাতোরু

নিজেকে আবিষ্কার করে ১৮ বছর অতীতে। ওর সহপাঠী কায়ো হিনাজুকি খুন হওয়ার ঠিক কয়েক দিন আগে। এর আগে কখনো সময়ের পথে এত দূর পাড়ি দেয়নি ও। এতকাল বহন করা চাপা হতাশা আর আক্ষেপ চালিত করে ওকে। দৃঢ়প্রত্যয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সাতোরু, যে করেই হোক বাঁচাতে হবে কায়োকে। বদলে দিতে হবে অতীত ইতিহাস। হয়তো তাহলেই রক্ষা পাবে আরও কিছু জীবন। কিন্তু, অজানা খুনি রয়েছে মুখোশের আড়ালে; খুনের পদ্ধতিও জানা নেই সাতোরুর। ঠিক কবে মেয়েটাকে খুন করা হয়েছিল, তা-ও ভুলে গেছে। আর সবকিছু জেনে ফেলতে পারলেও দিন শেষে ও শুধুই একটা শিশু, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কিছুই করার স্বাধীনতা যার নেই। এত প্রতিকূলতার বিপরীতে গিয়ে সাতোরু কি পারবে এই রহস্যের সমাধান করতে? জানতে হলে দেখতে হবে *বোকু দাকে গা ইনাই মাচি*।

বাড়িতে ফিরে মায়ের লাশ দেখে ঘাবড়ে যায় সাতোরু। আচমকা এক প্রতিবেশী এসে ওকে লাশের সঙ্গে দেখে ভুল বোঝে, পুলিশে খবর দেয়। ছুটে আসে পুলিশ বাহিনী। মায়ের খুনের আসামি হিসেবে তাদের সন্দেহ হয় সাতোরুকে।

একটু ব্যতিক্রম কাহিনি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করে। ঠিক এ কারণেই দেখেছিলাম অ্যানিমেটা। যতদূর মনে পড়ে, ২০১৬ সালেই দেখা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে হতাশ করেনি, তাই এত দিন পরও ঠিক মনে করে বলতে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। কেই সানবের লেখা এই গল্প ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয় কাদোকাওয়া শোতেন পরিচালিত মাসিক 'ইয়ং এইস' ম্যাগাজিনে। পরবর্তীকালে ইয়েন প্রেস প্রকাশনী থেকে ভলিউম আকারে ছাপা হয় *বোকু দাকে গা ইনাই মাচি*। এরই ধারাবাহিকতায় অ্যানিমে, তারপর তৈরি হয় চলচ্চিত্র। এ ছাড়া জনপ্রিয় মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স একটি লাইভ-অ্যাকশন সিরিজও এনেছে এই কাহিনির

ওপর। সুতরাং, পাঠক-দর্শকপ্রিয়তার আঙ্গিকে বিচার করলে সিরিজটিকে সার্বিকভাবে সফল বলা যায়।

তোমাদের মধ্যে যাদের রহস্য গল্প পছন্দ, তাদের ভালো লাগবে *বোকু দাকে গা ইনাই মাচি*। রহস্য কাহিনিতে সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক চরিত্রদের দেখা যায় ব্যতিব্যস্ত হতে, কিন্তু এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে ঘটনাটা অধিকাংশ সময় ছোট ছেলেমেয়েদের ঘিরেই চলেছে। গল্পের নায়ক সাতোরু নীরবে সবাইকে সাহায্য করার পথ খুঁজে চলে। কারও সঙ্গে সে ভাগাভাগি করে নিতে পারে না মূল সত্য। কারণ, এমন অভিনব সত্য কারও পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। যে বয়সে তারা সুপারহিরো নিয়ে আড্ডা দিতেই বেশি পছন্দ করে, ড্রাগনকোয়েস্ট খেলে সময় কাটায়, সেই বয়সে ওদেরই এক বন্ধু সময়ের পথ পাড়ি দিয়ে অতীতে চলে এসেছে, তা মানবেই বা কেন? কিন্তু, তা বলে তো থেমে থাকা যাবে না। প্রাথমিকভাবে কায়ো হিনাজুকিকে বাঁচাতে সাতোরুর প্রয়াস আমাকে আবেগতাড়িত করেছে।

ছোট্ট বয়সের ছোট্ট প্রেমের গল্প ভেসে উঠবে তোমাদের সামনে। নিজের নিজের সমস্যা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকা ছোট্ট মানুষ ওরা, কিন্তু সে বিপদ বহু জটিল। ভীষণ বিষাদেও মুখ বুজে চলতে থাকা সেই জীবনে যদি বন্ধুত্বের সুবাতাস বয়, তবে কেমন অনুভূতি হয়? তার উত্তর তোমরা পাবে সাতোরু আর কায়োর সম্পর্কের সমীকরণে। গল্পে সহায়ক চরিত্র হিসেবে রয়েছে সাতোরুর মা। আছে কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু, যাদের মধ্যে কেনইয়া কোবায়াশি বিশেষ। এ ছাড়া সাতোরুর স্কুলের শিক্ষক, রেস্তোরাঁর সহকর্মী প্রমুখের আনাগোনা গল্পে বিশেষ স্থান দখল করেছে।

তোমরা যারা একটু চালাক-চতুর, তারা হয়তো মূল আততায়ীর পরিচয় আগেই অনুমান করতে পারবে। তবে তাতে অ্যানিমের আবেদন কিছুমাত্র ম্লান হবে না। রহস্য গল্পে যেমন অপরাধ কে করেছে তা জরুরি, ঠিক তেমনই কীভাবে বা কেন করেছে, তা-ও জরুরি। হত্যাকারীর চরিত্র ও পুরো রহস্যের ব্যাখ্যা শেষ পর্ব পর্যন্ত ধরে রাখবে আগ্রহ।

অ্যানিমের শব্দের প্রয়োগ আমার মন্দ লাগেনি। বিশেষ করে অ্যানিমের পর্বগুলোর সমাপ্তিতে ব্যবহৃত, জাপানিজ গায়িকা সাইউরির কণ্ঠে 'সোরে ওয়া চিইসানা হিকারি নো ইউনা' গানটা আমার দারুণ লেগেছে। সাধারণত অ্যানিমের পর্ব দেখার সময় আমি গানটুকু না শুনে পরের পর্বে চলে যাই, এই গানের ক্ষেত্রে পারিনি। বারবার শুনেছি। এমনকি পরবর্তী সময়ে শিল্পীর আরও কিছু গান শুনে দেখেছি, দারুণ লেগেছে। তোমরাও শুনতে পারো।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছি, তাতে আশা করি, *বোকু দাকে গা ইনাই মাচি* সম্পর্কে তোমরা সামান্য হলেও আগ্রহী হয়েছ। সিরিজের জাপানিজ নামটিকে বাংলায় রূপান্তর করলে দাঁড়ায়, 'যে শহরে নেই আমি'। নামকরণ সার্থক হয়েছে কি না, তা বিচারের দায়িত্ব আমি তোমাদের ওপর ছেড়ে দিলাম। গল্পের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও বিভ্রান্তির ভিড় থেকে যেসব আনন্দের মুহূর্ত তোমরা খুঁজে পাবে, তা হয়তো তোমাদের সঙ্গে থেকে যাবে দুর্লভ মণিমাণিক্যের মতো। কিছু কিছু গল্প থাকে যা অনেকবার পড়া যায়, দেখা যায়; এটাও তেমনই এক কাহিনি।

জন্মদিন

তোমাদের অনেকের জন্মদিন নভেম্বর মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।

এ মাসে যাদের জন্মদিন—

১ নভেম্বর
নুরসিয়া তাইয়েবা
পঞ্চম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

৯ নভেম্বর
ফাতিহা রাদিয়াতুল
তৃতীয় শ্রেণি, জাহানারা ইসরাইল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল

জি.এম. ইশতিয়াক মাহমুদ
চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর

১৫ নভেম্বর
আনুভা জুয়ায়রিয়া

১৭ নভেম্বর
হুমাইদা রশীদ আরিবা
পঞ্চম শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

১৮ নভেম্বর
সারোয়ার জাহান
অষ্টম শ্রেণি, বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকা

সাজেদা তাসনিম
নবম শ্রেণি, দারুননাজাত মহিলা মাদরাসা, ঢাকা

২০ নভেম্বর
ইসরাত জাহান ইরা
দশম শ্রেণি, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

২৫ নভেম্বর
রাইনা হোসেন খান
মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

২৬ নভেম্বর
মারওয়ারিদ মুশাররাত
ষষ্ঠ শ্রেণি, অর্কিডস স্কুল, চট্টগ্রাম

তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন।

রূপালীক্যাশ
RUPALICASH
রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক নতুন আঙ্গিকে
নিজস্ব ব্র্যান্ডে নিয়ে এলো মোবাইল ব্যাংকিং সেবা
রূপালীক্যাশ
Add Money
Deposit Money to Other RBPLC Bank Account
Schedule Payment
Deposit Money to Own RBPLC Bank Account
Cash-out
Send Money
Merchant Payment
Cash-in
Scan To Cash-out
E-KYC
Mobile Recharge
Education Payment
Token-based Cash-out
আপনার ব্যাংকিং সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রাখতে
আজই রূপালীক্যাশ অ্যাপ ডাউনলোড করুন
রূপালী ব্যাংক পিএলসি
RUPALI BANK PLC
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা
ডাউনলোড করুন
www.rupalibank.com.bd

প্রিয় বন্ধুরা,

রকমারি.com

তোমরা তো জানো এই নভেম্বরে আমাদের সবার প্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ এর জন্মদিন। গল্পের জাদুতে যে মানুষটি আমাদের চোখে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন, তিনি হুমায়ুন আহমেদ। তাঁর লেখা শিশুকিশোর বইগুলোতে আছে দুষ্টুমি, কৌতূহল আর কল্পনার মায়াবী দুনিয়া। চল, তাঁর সেই রঙিন জগতে টুঁ মেরে দেখি তুমি কতটা জানো হুমায়ুন আহমেদকে?

হুমায়ুন আহমেদ এর বই নিয়ে নিচের কুইজগুলো উত্তর দাও আর জিতে নাও পুরস্কার!

উত্তরদাতা ৫ জনকে দেয়া হবে সর্বমোট **১০০০৳ গিফট ভাউচার।** যা দিয়ে পছন্দমত কেনাকাটা করতে পারবে **রকমারি** থেকে।

১. পিপলী বেগম গল্পে পিপলী অঙ্কে কত পেয়েছিল?

ক. ১০০ খ. ২৩ গ. ১৯ ঘ. ৩৩

২. রকমারিতে বয়স যখন ১২-১৭: উপন্যাস ক্যাটাগরির #১ বই কোনটি?

ক. পিপলী বেগম খ. বোতল ভূত গ. পুতুল ঘ. একি কাণ্ড!

৩. তোমাদের জন্য ভালোবাসা বইটি কাকে উৎসর্গ করে লেখা?

ক. প্রফেসর ড. আলী নওয়াব খ. গুলতেকিন খান গ. নুহাশ ঘ. কেউই নয়

৪. হুমায়ুন আহমেদ এর বেস্ট সেলার সায়েন্স ফিকশন কোনটি

ক. শূন্য খ. ইমা গ.তোমাদের জন্য ভালোবাসা ঘ.কুহক

৫. পুতুলের বয়স কত?

ক. ১১ খ. ১২ গ. ১৩ ঘ. ১৪

৬. সূর্যের দিন উপন্যাসটি কী নিয়ে লেখা?

ক. বিখ্যাত জীবনী খ. বিজ্ঞানের সুফল গ. মুক্তিযুদ্ধ ঘ. সবগুলো

৭. একি কাণ্ড! বইতে টুকুন কার সাথে কথা বলতো?

ক. বিড়াল খ. কুকুর গ. গাছ ঘ. কাক

৮. রকমারি সাইটে 'বাদশাহ নামদার' বইয়ের গড় রেটিং কত?

ক. ৪.৯ খ. ৩.৫০ গ. ৪.৫৭ ঘ. ৩.৯০

৯. রকমারিতে থাকা 'হিমু মামা' এর পৃষ্ঠা সংখ্যা কত?

ক. ১২০ খ. ৮০ গ. ৯০ ঘ.১০০

১০. নিচের কোনটি হুমায়ুন আহমেদ এর শিশুকিশোর বই?

ক. হিমু খ. হলুদ হিমু কালো র‍্যাব গ. হিমু মামা ঘ. এবং হিমু

চটপট বসে যাও প্রশ্ন নিয়ে আর তোমার নাম ও ফোন নাম্বার সহ উত্তর পাঠিয়ে দাও এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে - +88 0170 8166 230

[বি.দ্র.- সঠিক নাম ও নাম্বার ব্যতীত উত্তর বাতিল বলে গণ্য হবে]

হুমায়ুন আহমেদ তো আছেন গল্পে গল্পে- তোমার হাসিতে, কৌতূহলে, স্বপ্নে। তাই আজ একটু পড়ার সময় দাও, না পড়া কোন বই খুলে বসো-দেখবে গল্পও বন্ধুর মতো কথা বলে। উত্তরের ক্লু পেতে ভিজিট কর www.rokomari.com

হুমায়ুন আহমেদ এর লেখা বেস্ট সেলার ৫টি শিশু কিশোর বই-

ছোটদের সেরা গল্প

তোমাদের জন্য রূপকথা

বোতল ভূত

পুতুল

একি কাণ্ড!

সবগুলো বই দেখতে স্ক্যান কর

দেখে নাও গতমাসের **বেস্ট সেলার শিশু-কিশোর** বইয়ের তালিকা-

বুক আইডি	বই- লেখক	মুদ্রিত মূল্য
৪৪৯৪৫২	Chotoder English Therapy- Saiful Islam	৫৯৯
১১৯৩৪৯	**ইসলামী গল্প সিরিজ-১**- মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
৪৬৯৩৮	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১/১**- রকিব হাসান	১৬২
৩৪৬৬৮৯	**চাঁদের পাহাড়**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
৫৭৮৭৫	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ২/২**- রকিব হাসান	১০৯
৪১০৬২৭	**হিমালয়ের ভয়ঙ্কর**- হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৫০
১৩৭৭৯	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১/২**- রকিব হাসান	১৪১
১১৯৩৫০	**ইসলামী গল্প সিরিজ-২**- মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
১১৫৬৪৬	**এসো আল কুরআনের গল্প শুনি**- মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক	৭০
৪৭৬৮৭	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ২/১**- রকিব হাসান	১৩৭
৫০৯৭১৭	**কিশোর আলো (অক্টোবর ২০২৫)**- কিশোর আলো	৫০
১৩৩৬	**শূন্য**- হুমায়ূন আহমেদ	১৮০
৪১০৬২৯	**সূর্যনগরীর গুপ্তধন**- হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৮০
৪৭৮৫০৪	**কিশোরকণ্ঠ জুলাই ২০২৫**- কিশোরকণ্ঠ	৪০
২১৫৮৪৭	**চাঁদের পাহাড়**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
৩৯৪৬৪৮	**ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মজার মজার সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট**- কিডস্ বুকস্	১৮০
২০৬৬৭৩	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৪/১**- রকিব হাসান	১০৯
৫৭৮৪৭	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৩/১**- রকিব হাসান	১৫৮
৪৮৫৭৬২	**কিশোরকণ্ঠ আগস্ট ২০২৫**- কিশোরকণ্ঠ	৪০
৫৭৭৯২	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৩/২**- রকিব হাসান	১১৬
৫০২৯৩০	**কিশোর আলো (সেপ্টেম্বর ২০২৫)**- কিশোর আলো	৫০
৪৯৮৮১২	**কিশোরকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ২০২৫**- কিশোরকণ্ঠ	৪০
১৫৪৪৯৭	**ছোটদের মহাকাশ পরিচিতি**- মশিউর রহমান	২৫০
৩৬৭৩৪৮	**আবার যখের ধন**- হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৫০
১১৯৩৫১	**ইসলামী গল্প সিরিজ-৩**- মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
৭১৭৩৭	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৮**- রকিব হাসান	১০৪
২২১৯১৬	English Shikhbo Bangla Diye (Book 1-3)- Saifur Rahman Khan	৩৬০
৩৫২৬৬৩	**যকের ধন**- হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৫০
৪৩৯০০৫	**মিসমিদের কবচ**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২০
১১৯৩৫২	**ইসলামী গল্প সিরিজ-৪**- মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
৭১৭৩৪	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম -৫**- রকিব হাসান	১২৩
৪৩৯৫৬৬	**কী আছে মাথার ভেতরে?**- মাহমুদ জামিল	১৮০
৪৩৯৫৪৫	**কী আছে দেহের ঘরে?**- মুরসালিন নিলয়	১৮০
৭১৭৩৫	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৬**- রকিব হাসান	১০৯
৩৪৯৮৩৯	**সময়ের মূল্য**- প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম	১৪০
২৩৮৭১৭	**ছোটদের আখলাক সিরিজ**- শাবান মুস্তফা কাযামিল	৩০০
১১৫৬৪৫	**গল্প শুনি হাদিস শিখি**- মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক	১৬০
৬৯৭৬৫	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১**- রকিব হাসান	১২০
৫০১৮২১	**মুসলিম বিজ্ঞানীদের গল্প (লেভেল ০১)**- লিটল উম্মাহ টিম	৯০০
৫০৯৭১৪	**বিজ্ঞান চিন্তা অক্টোবর-২০২৫**- আব্দুল কাইয়ুম	৫০
৩৯০৮১৯	Kids Vocabulary- Nazrul Islam Sir	৩২০
১৪৩০৩২	**বড় যদি হতে চাও**- মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন	৩৬০
১৩১৯	**ছোটদের সেরা গল্প**- হুমায়ূন আহমেদ	২৫০
৪৩৯৫৩৩	**আল্লাহ ছাড়া নেইকো রব**- আসাদুল্লাহ ফুয়াদ	১৮০
৭১৭৩৬	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৭**- রকিব হাসান	১২৩
৪৪৭৪০৫	Kids English- Nazrul Islam Sir	৩২০
৩৩৩২৩৭	**প্রিয় নবী ও লাল পাখির গল্প**- আমিনুল ইসলাম হুসাইনী	১৪০
৩৭০৭৭০	Chotoder Vocabulary- Umme Maisun	২৬০
২১৬১২০	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৯**- রকিব হাসান	১২২
২৪৪৬৫৬	**ছোটদের আদব সিরিজ**- হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
৩৪৪৯৫৮	Kids Spoken English Nazrul Islam Sir	৪০০
২০৫৬৬২	**ছোটদের সাহাবি সিরিজ**- সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর	৯০০
৪৪৬২২২	**ভুল**- অন্তিক মাহমুদ	৮০০
৫০৩৩৬০	**ষোলো জুলাই অভ্যুত্থান সংখ্যা**- ষোলো টীম	৬০
৩৫৯৫৪২	**ফিজিক্স অলিম্পিয়াড সমগ্র ক্যাটাগরি গ**- তৌফিকুন নূর ফরিদ	৬০০
৪৩৯৫৪৪	**যেদিন সবার বিচার হবে**- আসাদুল্লাহ ফুয়াদ	১৮০
৪৩৯৫৬৭	**দেখি সবই দু-চোখ ভরে**- মুরসালিন নিলয়	১৮০
১১৯৩৫৩	**ইসলামী গল্প সিরিজ-৫**- মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
৩৮৭৯০৭	**ভূতের স্কুল**- সাব্বির আহমেদ সুবীর	১০০
৪৪৭২৭৮	Raodatul Atfal 1st Part- S M Nahid Hasan	২০০

রকমারিতে থাকা শিশুকিশোর ক্যাটাগরির বইগুলো দেখতে

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বই সংগ্রহ করতে স্ক্যান কর

KIAROK25 প্রোমোকোড ব্যবহার করে বই অর্ডারে বুঝে নাও এক্সট্রা ৫% ছাড়!

রকমারি.com

পণ্য হাতে পেয়ে মূল্য পরিশোধ করুন

যেকোন সমস্যায় হ্যাপি রিটার্ন সুবিধা

যা কিছু দরকারি সাথে আছে রকমারি

পিরিয়ডে কতটা রক্তক্ষরণ স্বাভাবিক

রাফিয়া আলম

পিরিয়ডের সময়কার রক্তক্ষরণ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। নির্দিষ্ট সময় পরপর এই রক্তক্ষরণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ঠিক কতটা রক্তক্ষরণ স্বাভাবিক, তা জানা খুব জরুরি। অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ কোনো রোগের লক্ষণ হতে পারে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে বাড়ে স্বাস্থ্যঝুঁকি।

কত দিন পরপর পিরিয়ড হচ্ছে এবং কত দিন ধরে কী পরিমাণ রক্ত যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যদি পিরিয়ড হয়, তাতেও কিন্তু সব মিলিয়ে বেশিই হচ্ছে রক্তক্ষরণ। এমন সব জরুরি বিষয়ে জানালেন ঢাকার কাকরাইলের ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা. নূরুন নাহার।

কখন পিরিয়ড শুরু হয়

সাধারণত ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সী কিশোরীর প্রথমবার পিরিয়ড হয়। তবে ৯ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত যেকোনো বয়সে পিরিয়ড শুরু হওয়া স্বাভাবিক। ৯ বছরের আগে পিরিয়ড শুরু হওয়া কিংবা ১৬ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও পিরিয়ড শুরু না হওয়া কোনো অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে।

কত দিন পরপর পিরিয়ড হয়

২১ থেকে ৩৫ দিন পরপর পিরিয়ড হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ একবার পিরিয়ড শুরু হওয়ার ২১ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে আবার পিরিয়ড শুরু হবে। যদি কারও ২১ দিনের আগে বা ৩৫ দিনের পর পিরিয়ড হয়, তাহলে তা অস্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হবে।

কতটা রক্ত যায়

পিরিয়ডের সময় তিন থেকে চার দিন রক্ত যায়। তবে ছয় থেকে সাত দিন পর্যন্তও রক্ত যেতে পারে কারও কারও। পিরিয়ডের প্রথম কয়েক দিন কিংবা শেষ কয়েক দিন রক্তপাত একটু কম হতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে কয়েক ফোঁটা রক্ত যেতে পারে পিরিয়ড শুরু হওয়ার দশম দিন পর্যন্তও। এটা স্বাভাবিক। তবে পিরিয়ডের মূল রক্তক্ষরণ যদি সাত দিনের বেশি থাকে, তা অস্বাভাবিক।

পিরিয়ডের সময় ২৪ ঘণ্টায় ৪ থেকে ৫ বার স্যানিটারি ন্যাপকিন বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ গড়পড়তা আকারের ৪-৫টি স্যানিটারি ন্যাপকিন মোটামুটি ভিজে যেতে পারে সারা দিনে। এর চেয়ে কম রক্তক্ষরণ হলে ক্ষতি নেই। তবে বেশি হলেই মুশকিল। বিশেষত কারও যদি দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই একটা স্যানিটারি ন্যাপকিন পুরো ভিজে যেতে থাকে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

খেয়াল রেখো, অল্প রক্ত গেলেও একটা স্যানিটারি ন্যাপকিন কখনোই ছয় ঘণ্টার বেশি সময় রাখতে নেই। তাতে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। আর পিরিয়ডের প্রতিটি দিনে খুবই কম রক্ত যাওয়াটাও কিন্তু অস্বাভাবিক হতে পারে।

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বোঝার আরও উপায়

পিরিয়ডের সময় মাঝেমধ্যে রক্তের চাকা যেতে পারে। তাতে ক্ষতি নেই। তবে ছোট ছোট চাকার পরিমাণ যদি বেশি হয় কিংবা অল্প পরিমাণেই যদি বড় আকারের চাকা যায়, তাহলে তা অধিক রক্তক্ষরণ বোঝাতে পারে। প্রশ্ন হলো, রক্তের চাকার আকার ছোট বা বড় বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়! মোটামুটি এক ইঞ্চির বেশি আকারের হলে সেটিকে বড় চাকা ধরে নিতে পারো।

কিছু স্যানিটারি ন্যাপকিন একটু বড় হয়, শোষণক্ষমতাও বেশি থাকে। সঠিকভাবে এ রকম ন্যাপকিন ব্যবহার করলেও যদি চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পোশাকে রক্ত লেগে যায়, তাহলে এটাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

বেশি বা কম রক্ত গেলে কী ক্ষতি

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্ত গেলে কিংবা ২১ দিনের আগেই আবার পিরিয়ড শুরু হলে আয়রনের ঘাটতি হতে পারে সহজেই। এমন হলে অতিরিক্ত দুর্বলতা বা ক্লান্তি অনুভব করতে পারো তুমি। মনোযোগের ঘাটতিও হতে পারে। রক্তস্বল্পতার ঝুঁকিও থাকে। রক্তস্বল্পতায় ভুগলে ফ্যাকাশে দেখাতে পারে, অল্পতেই হাঁপিয়ে পড়া বা বুক ধড়ফড় করার মতো সমস্যা হতে পারে। আয়রনের ঘাটতির কোনো উপসর্গ দেখা দিলে কিংবা মাথা ঘোরালে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

হরমোনজনিত সমস্যা কিংবা অন্য যে সমস্যার জন্য রক্ত বেশি বা কম যাচ্ছে, তা খুঁজে বের করা জরুরি। নইলে সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

কিশোর সুপার ড্রাই স্বাস্থ্য কুইজ ৫

১. একটি স্বাভাবিক মাসিক চক্রের সময়সীমা কত দিনের মধ্যে হওয়া উচিত?

ক. ২১ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে খ. ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে

২. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে শরীরে কীসের ঘাটতি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে?

ক. আয়রনের ঘাটতি খ. ভিটামিন সি-এর ঘাটতি

ওপরের কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নাও পুরস্কার। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জনকে দেওয়া হবে পুরস্কার। উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : স্বাস্থ্য কুইজ ৫, কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১২১৫। অথবা ই-মেইল করো editor@kishoralo.com- এ। সাবজেক্টে লিখবে : স্বাস্থ্য কুইজ ৫। উত্তর পাঠানোর শেষ সময় ২০ নভেম্বর।

স্বাস্থ্য কুইজ ৪ বিজয়ী

মারিয়া ইসলাম, দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

লামিয়া ইসলাম, দশম শ্রেণি, খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, খুলনা

অরিন তাসনিম, দশম শ্রেণি, মোহাম্মাদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ACI
পিরিয়ডে থাকো সুপার ড্রাই
কটন সফট
টপশিট
৬ লেয়ারের
অ্যান্টি-লিক চ্যানেল
চওড়া প্যাড
দিবে অধিক সুরক্ষা
স্ক্যান করো:
Regular Flow WINGS
freedom
Super Dry
Sanitary Napkin
15
Soft Like Cotton
Always Dry
Comfy & Light

ম্যাথ ক্যাঙারু

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বাংলাদেশ

মুনির হাসান

বিশ্বের শতাধিক দেশের প্রায় ৬৫ লাখ শিক্ষার্থী ২০২৫ সালের এই গণিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এ কারণে ম্যাথ ক্যাঙারুকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণিত প্রতিযোগিতা। তবে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যায় নিজের স্কুলে বা নিকটতম কেন্দ্রে। ২০২৬ সাল থেকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। ম্যাথ ক্যাঙারুর আয়োজকদের বার্ষিক সভা থেকে ফিরে শিক্ষার্থীদের এই খুশির খবর দিচ্ছেন মুনির হাসান।

এই অক্টোবরের ১৫-১৯ তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে জড়ো হয়েছেন শতাধিক দেশের দুই শতাধিক গণিতের অধ্যাপক, শিক্ষক ও গণিতকর্মী। উদ্দেশ্য—বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণিত প্রতিযোগিতা ম্যাথ ক্যাঙারুর আয়োজক সংস্থা Association Kangourou Sans Fronti res (AKSF)-এর ৩৩তম বার্ষিক সভা। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এর আগে আমরা বিশ্বের বৃহত্তম এই গণিত প্রতিযোগিতার সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছি। সেই আবেদন উপস্থাপন করতেই আমার যাওয়া। সভার শুরু ও শেষ হয় ম্যাথ ক্যাঙারুর সাধারণ অধিবেশন দিয়ে। সব সক্রিয় ও সাময়িক সদস্যদেশ সেখানে অংশ নেয়, আর আবেদনকারী দেশগুলো থাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে। প্রথম দিনেই জানলাম, বাংলাদেশের সাময়িক সদস্যপদের (provisional membership) বিষয়টি ভোটাভুটিতে উঠবে শেষ দিনের সাধারণ সভায়। নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশ প্রথমে সাময়িক সদস্য হয়; তিন বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর পায় পূর্ণ সদস্যপদ।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণিত প্রতিযোগিতা

১৯৯১ সালে ফরাসি গণিতবিদদের উদ্যোগে গঠিত হয় একেএসএফ। তখন আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের জনপ্রিয়তা বেড়েছে, কিন্তু সেটি কেবল প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যেই সীমিত। একটি দেশ থেকে সর্বোচ্চ ছয়জন শিক্ষার্থী সেখানে অংশ নিতে পারে। একেএসএফের প্রতিষ্ঠাতারা চাইলেন, গণিত শেখার আনন্দ আরও বেশি সংখ্যক শিশুর কাছে পৌঁছে দিতে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, একই দিনে সারা বিশ্বে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হবে, কিন্তু প্রতিটি শিক্ষার্থী অংশ নেবে নিজের দেশে এবং নিজের স্কুলে বা নিকটতম কেন্দ্রে। তারও আগে থেকে অস্ট্রেলিয়ায় অলিম্পিয়াড ছাড়াও সবার জন্য একটা গণিত প্রতিযোগিতা হতো। সেটার মতো করেই এই প্রতিযোগিতার কথা ভাবা হয়। সে জন্য এটির নাম হয় ক্যাঙারু ম্যাথ। এ প্রতিযোগিতা শুধু প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় নয়; প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত। শিক্ষার্থীদের ছয়টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়, যেন বয়স ও স্তর অনুযায়ী সবাই সমান সুযোগ পায়। ১ নম্বর ছকে শিক্ষার্থীদের ক্যাটাগরি দেখা যাবে।

ছক-১ : ম্যাথ ক্যাঙারুর ক্যাটাগরি ও শ্রেণি বিভাজন

ক্যাটাগরি	শ্রেণি (সমতুল্য)	বয়স (প্রায়)
প্রি-ইকোইলার	প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণি	৬-৭ বছর
ইকোইলার	তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণি	৮-৯ বছর
বেনজামিন	পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণি	১০-১১ বছর
ক্যাডেট	সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি	১২-১৩ বছর
জুনিয়র	নবম-দশম শ্রেণি	১৪-১৫ বছর
স্টুডেন্ট	১১-১২ শ্রেণি	১৬-১৭ বছর

প্রশ্ন কেমন, পরীক্ষা কেমন

ম্যাথ ক্যাঙারুর বৈশিষ্ট্য হলো বয়স ও শ্রেণিভিত্তিক সিলেবাস। তৃতিয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর প্রশ্ন কখনোই পঞ্চম

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণিত প্রতিযোগিতা ম্যাথ ক্যাঙারু

শ্রেণির স্তরের হয় না। এখানে জোর দেওয়া হয় যুক্তি অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ ও সৃজনশীলতায়। এটি মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা নয়। সাধারণত কোনো সূত্র বা ফর্মুলা ব্যবহার করে প্রশ্নগুলো সমাধান করা যায় না, চিন্তা করলেই উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিটি ক্যাটাগরিতে ৭৫ মিনিটের একটি বহু নির্বাচনী প্রশ্নে (MCQ) পরীক্ষা হয়। প্রতিটি প্রশ্নের ৫টি সম্ভাব্য উত্তর থাকে—সঠিক উত্তরটি বেছে নিতে হয় যুক্তি দিয়ে বা গাণিতিক পদ্ধতিতে, আন্দাজে নয়। প্রশ্ন থাকে তিন স্তরে—সহজ, মাঝারি ও কঠিন। সহজ প্রশ্নে সঠিক উত্তরে ৩ নম্বর, মাঝারি প্রশ্নের সঠিক উত্তরে ৪ নম্বর ও কঠিন প্রশ্নের সঠিক উত্তরে ৫ নম্বর পাওয়া যায়। তবে ভুল উত্তরে এক নম্বর কাটা হয়। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত তিন ক্যাটাগরিতে মোট প্রশ্ন থাকে ২৪টি আর সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্যাটাগরিগুলোতে ৩০টি করে প্রশ্ন থাকে।

কারা তৈরি করেন প্রশ্ন

প্রতিবছর প্রতিযোগিতা শেষে সব সদস্যদেশ তাদের নিজস্ব প্রশ্ন প্রস্তাব করে। এসব প্রশ্নে সদস্যদেশগুলোর প্রতিনিধিরা মতামত ও রেটিং দেন। এরপর একেএসএফ একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করে সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে। বার্ষিক সভায় অংশ নিয়ে সবাই মিলে সেই

প্রশ্ন যাচাই-বাছাই করেন—বয়স উপযোগী কি না, আগে কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে কি না, ভাষাগতভাবে স্পষ্ট কি না—এসব দেখে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুলের এবারের সভাতেও প্রায় ২০০ গণিতবিদ মিলে ২০২৬ সালের প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করেছেন।

কখন হয় পরীক্ষা

প্রতিবছর মার্চ মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার ম্যাথ ক্যাঙারু ডে পালিত হয়। সেদিন সারা পৃথিবীতে একই প্রশ্নে একই সঙ্গে পরীক্ষা হয়। তবে কোনো দেশ চাইলে বাস্তবিক কারণে কয়েক দিন পরেও আয়োজন করতে পারে। ২০২৬ সালের ম্যাথ ক্যাঙারু ডে হবে ১৯ মার্চ, যা বাংলাদেশে ঈদুল ফিতরের সময়ের কাছাকাছি। তাই আমাদের দেশে প্রথমবারের আয়োজন হবে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে।

ফলাফল ও পুরস্কার

এখানে পাস-ফেল নেই। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের স্কোর জানতে পারে। তাতে শিক্ষার্থী যেমন নিজের শক্তি-দুর্বলতা জানতে পারে, তেমনি তার স্কুলও জানতে পারে কোথায় উন্নতির সুযোগ আছে। প্রতিটি দেশে সেরা ১ শতাংশ শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়—তাদের মধ্যে প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ স্বর্ণ, এক-তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং বাকিরা ব্রোঞ্জপদক পায়।

প্রশিক্ষণ ও ক্যাম্প

যেহেতু প্রশ্নগুলো সাধারণ সিলেবাসের হলেও পদ্ধতিতে ভিন্ন, তাই অনেক দেশেই অনলাইন ও অফলাইনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের। প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্যাম্পও আয়োজন করা হয়, যেখানে সেরা শিক্ষার্থীরা নতুনভাবে চিন্তা করা শেখে—খেলার মতো আনন্দে।

বাংলাদেশও এখন সাময়িক সদস্য

বাংলাদেশে সব শিক্ষার্থীকে আনন্দে গণিত শেখা ও যাচাই করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আনন্দে গণিত শেখার কার্যক্রমকে বিস্তৃত করার জন্য ম্যাথ ক্যাঙারুকে বাংলাদেশে নিয়ে আনা। ম্যাথ ক্যাঙারু বাংলাদেশ সেই সুযোগটাই করে দেবে। এখানে শিশুরা নিজের স্কুলেই অংশ নেবে, শিক্ষকেরা হবেন প্রধান সংগঠক আর অভিভাবকেরা দেখতে পাবেন—গণিত ভয় নয়, আনন্দ। ইস্তাম্বুল সভার শেষ দিনে ভোটাভুটির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সাময়িক সদস্যপদ (Provisional Membership) প্রদান করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (BdOSN) এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ সাল থেকে ম্যাথ ক্যাঙারুর আয়োজন করতে পারবে। আগামী তিন বছর এই কার্যক্রম পরিচালনার পর বাংলাদেশ পূর্ণ সদস্যপদের যোগ্যতা অর্জন করবে।

বাংলাদেশে ম্যাথ ক্যাঙারুবিষয়ক ওয়েবসাইট - http://kangaroomathbd.org/

জানো তো?
সস্ মিক্সের আসল স্বাদে
অথেনটিক রামেন মানেই
চপস্টিক রামেন!
চপস্টিক
রামেন
সস্ মিক্স আর সিজনিংয়ের
অথেনটিক কম্বিনিশনে
1st EVER
AUTHENTIC
RAMEN
OF BANGLADESH
বিস্তারিত
জানতে
স্ক্যান
করুন
Chopstick
RAMEN
HOT CHICKEN
Chopstick
RAMEN
HOT CHEESE
স্কয়ার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ

আমার লড়াই শুধু আমার সঙ্গে অন্যদের সঙ্গে নয়

বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মারুফা আক্তার

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের তারকা পেসার মারুফা আক্তার। মাত্র ২০ বছর বয়সেই গতি আর সুইং দিয়ে সবার নজর কেড়েছেন তিনি। খেলা বিষয়ক ম্যাগাজিন স্পোর্টস্টার অবলম্বনে বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর পেসারের উত্থানের গল্প লিখেছেন **কাজী আকাশ**

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে মারুফার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ছিল, বড় মঞ্চে খেলার স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় পাকিস্তানের বিপক্ষে দলকে জেতানোর পর মারুফা বলেন, 'আমি ঘুমানোর সময়ও ভাবতাম, প্রথম ম্যাচেই আমাকে ভালো করতে হবে। আমিই হব ম্যাচ উইনার।' পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের পিচ স্লো হবে, তা বোঝাই যাচ্ছিল। বাংলাদেশের একাদশে স্পিনারদের ভিড়ে মারুফাই ছিলেন একমাত্র পেসার। কিন্তু ২০ বছর বয়সী এই তরুণী প্রমাণ করেছেন, তিনি থাকলে দলে একজন পেসারই যথেষ্ট। মারুফার গতি আর সুইং দুর্দান্ত। ব্যাটারদের জন্য রীতিমতো ত্রাস হয়ে ওঠেন তিনি।

মারুফার আইডল অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি মিচেল

স্টার্ক। পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনি স্টার্কের মতোই বিধ্বংসী ছিলেন। ডানহাতি ব্যাটারদের জন্য তাঁর ইনসুইং ছিল ভয়ংকর। প্রথম ওভারেই ওমাইমা সোহেল ও সিদরা আমিনকে পরপর ২ বলে আউট করে পাকিস্তানকে বিপদে ফেলে দেন মারুফা। ২টি বলই ছিল 'আনপ্লেয়েবল'। বাংলাদেশে তো বটেই, বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তিদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে মারুফার বোলিং। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি লাসিথ মালিঙ্গা সেই জোড়া উইকেটের একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করে লিখেছেন 'দারুণ দক্ষতা, চমৎকার নিয়ন্ত্রণ। এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের সেরা ডেলিভারি।'

মারুফার এই কীর্তি ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানেও তিনি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পরপর ২ বলে বিস্মি গুনারত্নে ও আনুশকা সঞ্জীবনীকে আউট করেছিলেন। এর আগের ওভারেই তিনি ফিরিয়েছিলেন লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুকে। সেদিন বাংলাদেশের নেওয়া ৩ উইকেটের সব কটিই পেয়েছিলেন মারুফা। যদিও বাংলাদেশ ম্যাচটি হেরে গিয়েছিল।

২০২৩ সালে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে জয়েও মারুফা ছিলেন নায়ক। মাত্র ২৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নেন তিনি। স্মৃতি মান্ধানা, প্রিয়া পুনিয়া, আমানজ্যোত কৌর ও স্নেহ রানাকে আউট করে ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত করেন মারুফা।

ভারতের স্মৃতি মান্ধানাও মারুফার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'ওর বয়স কত, সেটা বড় কথা নয়। মাঠে ও যে চেষ্টা করে এবং ভালো ক্রিকেটার হওয়ার যে আগুন ওর মধ্যে আছে, তা দারুণ। ওর বলগুলো প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি স্কিড করে। ঢাকার ধীরগতির উইকেটে ও খুব বেশি সাহায্য পাচ্ছে না। ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ায় কী করে,

তা দেখতে হবে।'

একসময় মারুফা ছিলেন ছিপছিপে এক কিশোরী। মাঠে বলের পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। প্রতিটি উইকেট পাওয়ার পর গর্জে উঠতেন ডানহাতি এই পেসার। এখন তিনি আরও পরিণত। গতি বাড়াতে জোর দিয়েছেন ফিটনেস ও পাওয়ার ট্রেনিংয়ের ওপর। এই পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশের সাবেক স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ ইয়ান ডুরান্টের অধীন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের একটি ভিডিওতে মারুফা বলেন, 'আগে আমি ২৫-৩০ কেজি বেঞ্চ প্রেস করতাম। এখন করি ৪২-৪৪ কেজি। আর ৩০-৩৫ কেজি ওজনের স্কোয়াট এখন ৬০ কেজিতে পৌঁছেছে।'

মন দিয়ে অন্যদের খেলাও দেখেন মারুফা। পাকিস্তানের ডায়ানা বেগ তাঁর বিশেষ পছন্দের। মারুফা বলেন, 'উনি বেশি শক্তিশালী। ওনার সুইংও আমার পছন্দ। ইনসুইং ও আউটসুইং—দুটোই করতে পারেন তিনি।'

অধিনায়কের চোখে মারুফা

মারুফার শুরুটাও ছিল দুর্দান্ত। ২০২৩ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন তিনি। ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসেও তাঁর পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি স্টাম্পের পেছন থেকে মারুফার উন্নতি দেখেছেন। জ্যোতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'প্রথম দিকে ও বোলিং নিয়ে খুব বেশি ভাবত না। আমিই ওকে পরিকল্পনা সাজাতে সাহায্য করতাম। কিন্তু ও এখন অনেক পরিণত। এখন নিজের বোলিং-কৌশল নিয়ে ভাবে। ডেথ ওভারে কেমন বল করবে বা বাঁহাতি ব্যাটারদের কীভাবে অ্যাটাক করবে, তা নিয়েও পরিকল্পনা করে।'

জ্যোতি আরও বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন আমাদের দেশে এমন খেলোয়াড় দেখিনি। ও সত্যিই অনন্য। খুব পরিশ্রমী। ওর অ্যাকশনটাও আলাদা। এভাবে গতি আর সুইং একসঙ্গে করতে পারে, এমন খেলোয়াড় বাংলাদেশে আর নেই। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার, কোচরা ওকে ওর মতোই থাকতে দিয়েছেন। তাঁরা শুধু ওর দক্ষতাকে আরও ধারালো করছেন।'

মাঠ থেকে মাঠের লড়াই

একটা সময় মারুফার জীবন ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। করোনা মহামারির সময় আরিফা জাহান বিথির শেয়ার

মারুফা এখন আরও পরিণত
ছবি : প্রথম আলো

মারুফা আক্তার। ছবি : প্রথম আলো

করা ভিডিও মারুফাকে আলোচনায় নিয়ে আসে। বিথি রংপুরে 'ওমেন্স ড্রিমার ক্রিকেট একাডেমি' চালান। এটি মেয়েদের জন্য বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র একাডেমি। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মারুফা হলুদ জ্যাকেট পরে তাঁর বাবার সঙ্গে ধানের জমিতে লাঙল দিচ্ছেন। এর আগেই তিনি ক্রিকেট স্কাউটদের নজরে পড়েছিলেন। কিন্তু মহামারি আসায় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর ক্যারিয়ার শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

আরিফা জাহান আনুষ্ঠানিকভাবে মারুফাকে প্রশিক্ষণ না দিলেও তিনি সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন। ৩৫০ জন মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেন আরিফা। তিনি জানেন, মারুফার মতো প্রতিভা কতটা দুর্লভ। আরিফা জাহান বলেন, 'মারুফা ছোটবেলা থেকেই মাঠে কঠোর পরিশ্রম করত। ও একজন সহজাত অ্যাথলেট। প্রথম ওভারে ওই ২টি উইকেট নেওয়া দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। এ দেশের কোনো খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আমি এমন পেস বোলিং দেখিনি।'

বদলে যাওয়া জীবন

মারুফার পরিবার কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। লিজ নেওয়া জমিতে তাঁদের সংসার চলে। মারুফার এই উত্থান তাঁর পরিবারের সদস্যদের জীবন বদলে দিয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে তাঁর বাবার মনোভাবে। মারুফা আগে বলেছিলেন, 'শুরুতে আমার পরিবার আমাকে খুব একটা সমর্থন করত না। বাবা একজন কৃষক। তাই তিনি চাইতেন, আমি একটা সাধারণ চাকরি করি। কিন্তু আমি যখন খেলায় দিন দিন ভালো করতে শুরু করলাম, পরিবার আমাকে খুব সমর্থন করতে শুরু করে।'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১৫ বছর বয়সে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ট্রায়ালে নজর কাড়েন মারুফা। এরপর বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়া আর এখন জাতীয় দলের প্রধান পেসার। মারুফার এই যাত্রা যে কারও জন্যই অনুপ্রেরণার। একসময়কার লাজুক কিশোরী এখন একজন আত্মবিশ্বাসী পেসার। হাসিমুখে বড় বড় খেলোয়াড়কে চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন তিনি।

মারুফাকে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ বা বিগ ব্যাশ লিগে খেলার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি তখন মিডিয়া ম্যানেজারের দিকে তাকান। মিডিয়া ম্যানেজার এড়িয়ে যান বিষয়টি। তবে আরিফা বিশ্বাস করেন, মারুফার প্রতিভা উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ খেলার যোগ্য। জ্যোতিও মনে করেন, 'বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোকে আকৃষ্ট করবে। এতে সে আরও বেশি পরিচিতি পাবে। তবে ওকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও শক্তি বাড়াতে হবে। ও এখনো তরুণ। ওর অ্যাকশনটা সত্যিই ইউনিক।'

আপাতত মারুফার মন্ত্র একটাই—তাঁর লড়াই সব সময় শুধু নিজের সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে নয়। বিশ্বকাপে যাঁরা এখনো তাঁর মুখোমুখি হননি, তাঁদের জন্য এটা একটা শান্ত সতর্কবার্তা। ক্রিকেট-বিশ্ব তাঁর খেলা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

কিআ মিম কনটেস্ট ৮

আরও সেরা ১০

১

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আম্মু যখন নতুন কোচিংয়ে নিয়ে যায়

আলী আবরার
সপ্তম শ্রেণি, কক্সবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, কক্সবাজার

২

আমাকে নিয়ে সবার সামনে মশকরা করার পর আমাকে আবার যখন ডাকতে আসে।

অপ্সরা
কল্যাণপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সেরা মিম

ধুমাইয়া পিটানোর পর মা যখন খাওয়ার জন্য ডাকে আর বলে, 'তোর ভালোর জন্যই সব করি।'

মাশফি নেহা
অষ্টম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

৩

বাসায় গেস্ট আসলে আমি

রাইদাহ মাহরিন
অষ্টম শ্রেণি, মইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

৪

যখন মা আমার অলস বোনকে কাজ করতে বলেন

সারিম রাশিক
অষ্টম শ্রেণি, সানিডেল স্কুল, ঢাকা

৫

প্রিয় দল হারার পর বন্ধু যখন বাইরে যেতে ডাকে।
তখন আমি...

রাহুল
নবম শ্রেণি, নানুপুর উচ্চবিদ্যালয়, চাঁদপুর

৬

মা যখন সকাল সাতটায় আমাকে ডেকে তুলে স্কুলে যেতে বলে, তখন :

আফিফ ফারওয়াহ
চতুর্থ শ্রেণি, কাতালগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

৭

সুপারশপে আমার ছোট ভাইকে পছন্দের খেলনা না কিনে দিলে তার অবস্থা...

রামিন নাওয়াফ ফাইয়াদ
ষষ্ঠ শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ময়মনসিংহ

৮

কেউ যখন আমাকে পড়তে বলে লে আমি :

মাবরুর মোরশেদ
চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

৯

ছোট বোনকে না দিয়ে কিছু খেয়ে ফেলার পর ছোট বোনের অবস্থা :

মোহাম্মদ তামজীদ রহমান
উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

১০

বন্ধু যখন আমার সঙ্গে রাগ করে

মো. নানজিব ফাহিম
অষ্টম শ্রেণি, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

তোমাদের মিমগুলো দারুণ! প্রচুর মিম পেয়েছি আমরা। সেরা কয়েকটি মিম ছাপা হলো এ সংখ্যায়। মিম কনটেস্ট ছাড়া আরও মিম পাঠাতে পারো তোমরা।

রাতে ফোন চার্জ দিয়ে যখন সুইচ অন করতে ভুলে যাই, এরপর সকালে লে আমি :

মোহাম্মদ গোলাম মুস্তাকিম
সপ্তম শ্রেণি, হাউজিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট পাবলিক স্কুল, চট্টগ্রাম

মারিয়া তাহসিন
সপ্তম শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ,ঢাকা

ক্লাসে আসার পর বন্ধু যখন বলে, আজকে তার থেকে ধার নেওয়া ৫০ টাকা শোধ করার দিন।

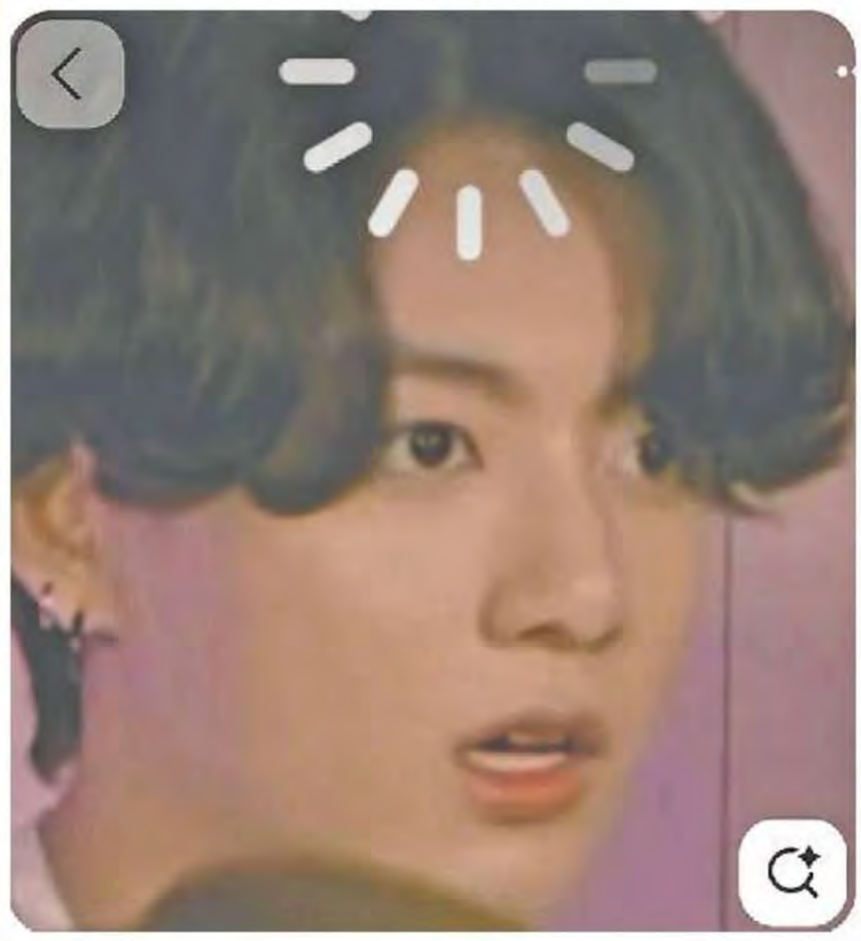

বাসায় আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত দিতে যাই, তখন আমার বড় বোন

মাশফি নেহা
অষ্টম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

কিআ মিম কনটেস্ট ৯

সারা দিন তো মিম দেখেই কাটাও। এবার মিম বানিয়ে পাঠাও। নিচে আমরা একটা মিমের ছবি দিলাম। তোমরা ক্যাপশন লিখে পাঠাও। নিয়মটা খুব সহজ। কীভাবে পাঠাতে হবে, তা বিস্তারিত লেখা আছে নিচে।

.....

রঈসা জাহান
ষষ্ঠ শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

আমি ছাড়া গ্রুপের সব বন্ধু পরীক্ষায় এ+ পাওয়ার পর একা আমি

কিচ্ছু কমু না...
আগে কাহিনিডা বুইজ্জা লই...

নিয়মটা আগের মতোই। ওপরের ছবিটা ভালোভাবে দেখো। তারপর ফাঁকা বক্সে কী হবে, তা লিখে পাঠাও কিআর ই-মেইলে। বক্সে কী লেখা হবে, শুধু সেটাই লিখবে ই-মেইলের বডিতে। আর সাবজেক্টে লিখবে—'কিআ মিম কনটেস্ট ৯'। লেখার সঙ্গে তোমার নাম, ঠিকানা, মুঠোফোন নম্বর, স্কুলের নাম, শ্রেণি আর ঠিকানা অবশ্যই পাঠাবে। মিম পাঠানোর শেষ সময় **২০ নভেম্বর**। মিম কনেটেস্টের বাইরেও তোমরা নিজের বানানো মিম পাঠাতে পারো। সে ক্ষেত্রে ই-মেইলের সাবজেক্টে লিখবে—মিম।

তোমাদের পাঠানো সেরা মিমগুলো ছাপা হবে কিশোর আলোয়।

রুচি টুটি আর ডাইনো!

আঁকা ও লেখা : **মেহেদী হক**

বিড়াল

লুচি! তোর কত মজারে। অঙ্ক করা লাগে না, স্কুল নাই, কিছু নাই।
বড় হয়ে চাকরিও করা লাগবে না। এইরকম একটা জীবনের যদি কোনো সূত্র থাকত।
আছে তো।
একটানা এতক্ষণ অঙ্ক করা ঠিক হয় নাই।

বাড়িয়ে নিন স্বাদ
রুচি
সস্ এবং কেচাপ

উপকারী প্রাণী

মায়ের থেকে আমরা অনেক উপকার পাই। সে আমাকে স্কুলে নিয়ে যায়, আমার ব্যাগ টানে।
চুল আঁচড়ে দেয়, খাইয়ে দেয়।
জুতার ফিতা বাঁধে।
মায়ের থেকে আমরা পাই দুধ (যদিও পছন্দ করি না), চকলেট, ললিপপ ইত্যাদি। তাই আমরা বলতে পারি...
..মা একটি উপকারী প্রাণী? এই তোর রচনা
হ্যাঁ। তোমার চেয়ে উপকারী প্রাণী আর নাই

কোন্‌টা ছেড়ে
কোন্‌টা খাবো?
রুচি
পটেটো ক্র্যাকার্স
স্কয়ার

মুড

কিসের আওয়াজ?
নিশ্চয়ই কেউ ঝুরিভাজা খাচ্ছে!
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ
রুচি ঝুরিভাজা
দারুণ কুড়মুড়ে! দারুণ মচমচে!

Reedisha
ILUBiLU
Wafer

অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু

পর্ব : ৫৮

লেখা : আদনান মুকিত
আঁকা : সব্যসাচী চাকমা

উত্তর দাও উপহার নাও

- **মন্টু কেন এসেছিল?**
  ক. বাসা ভাড়া নিতে খ. চাঁদা চাইতে
- **পুলিশকে খবর দিয়েছে কে?**
  ক. ডেলিভারি ম্যান খ. ইলু

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ৩ জনকে দেওয়া হবে উপহার।
উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু**
রিদিশা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড, ৩৬ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৮। অথবা,
Email: badsha.rfbl@groupreedisha-bd.com

অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু - গত সংখ্যার বিজয়ী

জেরিন তাবাসসুম, অষ্টম শ্রেণি, লোহাগড়া সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়
বিকেএম তাসভীর জামী, নবম শ্রেণি, আকিজ কলেজিয়েট স্কুল, যশোর
জুইফুর রহমান, একাদশ শ্রেণি, ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা

* শর্ত প্রযোজ্য

Reedisha
ILUBiLU
Wafer

তাইলে আর যামু কই? পিৎজা কি খাইয়া যামু, নাকি সেই টাইমও দিবেন না?

খা। কাল থেকে তো খাবি জেলের ভাত। কিন্তু তুই এইখানে ক্যান?

এই বাড়ির যে মালিক...বুড়া চাচার কাছে চান্দা চাইসি। দেয় না। এত বড় বাড়ি বানাইসে, আমগো চান্দা দিব না? আমরা খামু কী? কয় দিন আগে মাত্র ছাড়া পাইসি। ট্যাকা লাগব না?

পরে আর কী! চাচারে কইলাম, সন্ধ্যার মধ্যে চান্দা না দিলে আপনার নাতিরে আর বাসায় দেখবেন না। টিভিতে দেখবেন। তারপর আর কী...

প্রথমে পিৎজা খাইলাম, তারপর খাইলাম ধরা। আমারে কি স্যার আগের জেলেই রাখবেন? ওইখানে খাওন ভালো না...

চুপ থাক। কথা তো এখনো বেশি বলিস। কোনো শিক্ষা হয় নাই তোর।

কিন্তু স্যার, আপনেরা আমার খোঁজ পাইলেন কেমনে? এদিক দিয়া যাইতাসিলেন? নাকি পিৎজা খাইতে...

অ্যাই চোপ! আমাদের খবর দিয়েছে এই পিৎজার ডেলিভারিম্যান।

অয় জানল কেমনে?

আমি জানিয়েছি। ফুড ডেলিভারির অ্যাপে মেসেজ পাঠানোর অপশন আছে। আমি ওনাকে পুরো ঘটনা লিখে বলেছি পুলিশকে কল দিতে। উনি দিয়েছেন। আর পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে।

জোশ! জোশ!

শাবাশ ইলু!

মন্টু, শেষমেশ ইলু বিলুর কাছে ধরা খাইলি! লজ্জা লাগতেসে না?

হ স্যার। এমনেই কবজি কাটা, এখন লজ্জায় মাথাও কাটা গেল। এই লাইন ছাইড়া দিতে হইব।

চলবে

বাসব রায়
এই যে দেখছেন এই বস্তুটি, যে-সে জিনিস নয় এ স্যার। এ আমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের গবেষণার ফসল।

অংকলম

এর নাম "অংকলম'। এই কলম দিয়ে অঙ্ক কষলে অঙ্কের উত্তর কখনো ভুল হয় না। ভুল হবেই না, অঙ্ক কষতে এই কলম ওস্তাদ!
তবে তার আগে একটু প্রস্তুতি আছে। প্রথম তিপ্পান্ন সপ্তাহ এই কলমটিকে ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন।
বেশি না, এই কলমটি ব্যবহার করে রোজ দুই শ পিস যোগ-বিয়োগ করলেই এর শিক্ষা পর্ব সমাপ্ত হয়ে যায়। তারপর চুয়ান্নতম সপ্তাহ থেকে শুরু হয় এর খেল!
যত কড়া অঙ্কই হোক না কেন, তার পর থেকে উত্তর সব বেরোয় খাঁটি আর পরীক্ষায় নম্বরের হয় ছড়াছড়ি!
আজ এই মহাপুণ্যদিনে আমার এই মহামূল্যবান আবিষ্কারটি এক কোটি নয়, দুই কোটি নয়, হাজার কোটির বিনিময়েও নয়—
সেরেফ বিনা মূল্যে আমি আপনার যোগ্য হাতে তুলে দিতে চাই।
হুম
খালি মনে রাখবেন, রোজ দুই শ পিস যোগ-বিয়োগ।

বকবক করে করে শেষ হয়ে গেলাম। এই দস্যিগুলো দিয়ে নিয়মিত অঙ্ক প্র্যাকটিস করানোর ফন্দি করা কম ঝক্কির কাজ নারে বাবা!

পরের দিন

এই যে দেখছেন এই বস্তুটি, যে-সে জিনিস নয় এ স্যার। এ আমার দীর্ঘ গবেষণার ফসল।

এক কোটি নয়, দুই কোটি নয়, হাজার কোটির বিনিময়েও নয়—

অধ্যায়-১৬

কেমন করে উড়তে হয় না

ফাহিম আনজুম রুম্মান

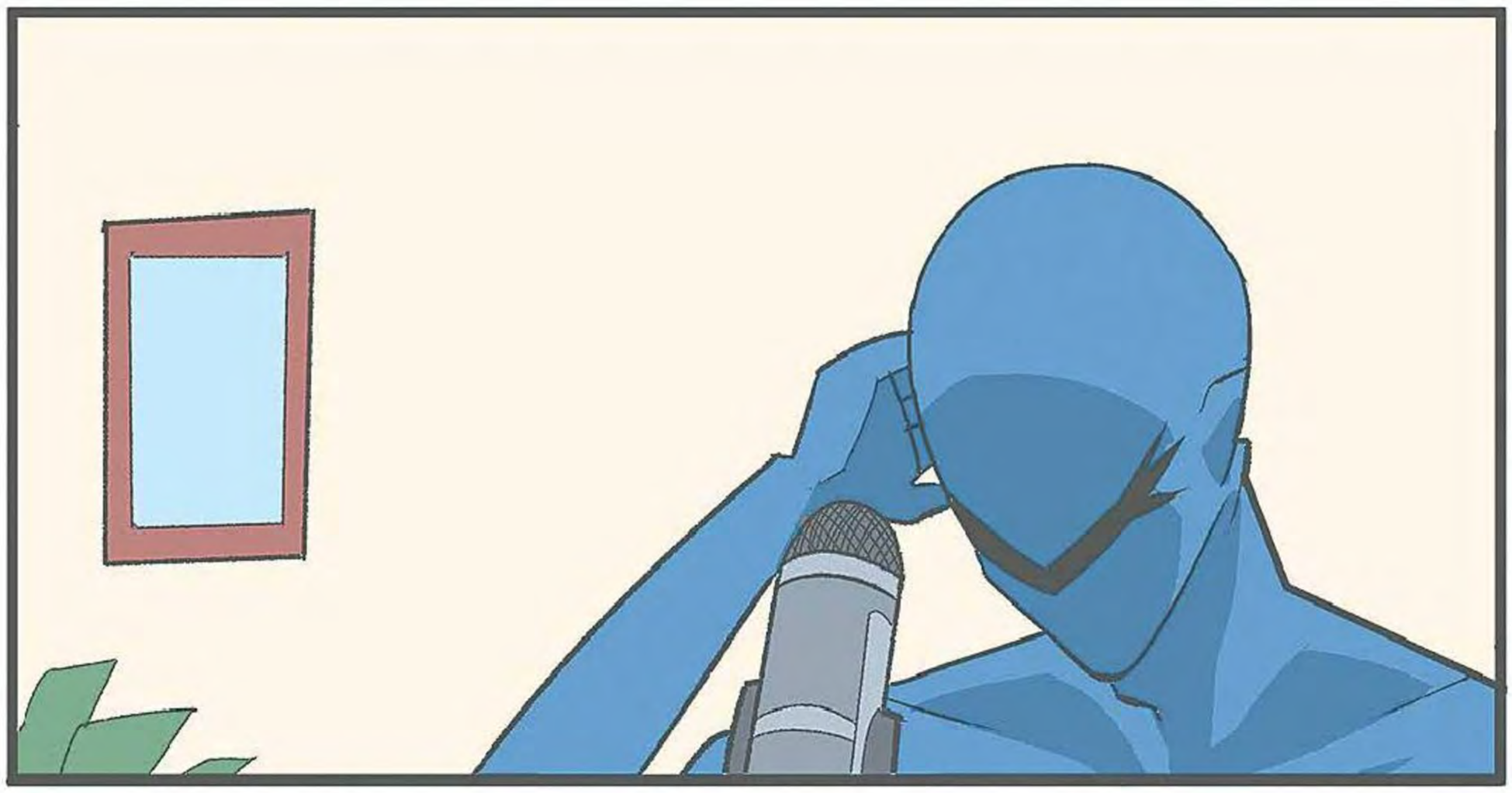

আমার কারণে...
আমি ভুল করে মেরে ফেলেছি
একজনকে!

আমি একজন সুপারহিরো
হতে চেয়েছিলাম।
কিন্তু উল্টোটি হয়েছে।

এটা তাই আমাদের
শেষ পর্ব।
হাহ! তাই যদি হতো!

কে আপনি? এখানে কেমন করে এলেন?

আমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি!

আর আমরা অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু!

আ...আলতাফ?

কিন্তু এখনই না, ভবিষ্যতে!

চলবে

সবাই কেন রোব্লক্স খেলে

আসহাবিল ইয়ামিন

আজকের দিনে ভিডিও গেমের জগতে যদি কোনো একটি প্ল্যাটফর্মকে বিশাল এক 'ভার্চুয়াল খেলার মাঠ' বলা হয়, তবে নিঃসন্দেহে সেটা রোব্লক্স (Roblox)। ছোট থেকে বড় সব বয়সের মানুষের কাছেই এর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। কিন্তু কেন? সবার কাছে এটি কি শুধু একটি গেম নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু? বেশির ভাগ ভিডিও গেমের থাকে কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম। নিয়মগুলোর মধ্যেই সীমিত থাকে গেমগুলো। কিন্তু রোব্লক্সের জগৎটা একদম আলাদা। কারণ, এর দুনিয়ার যেন কোনো শেষ নেই।

রোব্লক্সকে তুমি বলতে পারো অনলাইন গেমের এক বিশাল 'সুপারমল'। এটা শুধু একটা গেম নয়। এটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তুমি শুধু গেম খেলবে তা নয়, এখানে তুমি নিজেই গেম বানাতেও পারবে।

রোব্লক্সের জগৎ তোমার কল্পনার মতো, যার কোনো সীমা নেই। এখানে যে শুধু নিজের কল্পনা ও আইডিয়াগুলোকেই বাস্তবে দেখতে পাবে, এমনটা না। সারা বিশ্বের সবার সৃষ্টিও দেখতে পাবে। সেটা রেসিং ট্র্যাক, রোল-প্লেয়িং কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য একটা ভার্চুয়াল টাউন তৈরি করা—যেটাই হোক, তুমি সেসবই এখানে তৈরি করে ফেলতে পারবে। আর এই প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিনই নতুন নতুন মজার গেম আসে। ফলে একঘেয়ে হওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, রোব্লক্সের অধিকাংশ গেম খেলতে কোনো টাকা লাগে না। এসব দারুণ গেম তৈরি করেছে কে জানো? তোমার-আমার মতোই সাধারণ ব্যবহারকারী বা শখের ডেভেলপাররা। তাই স্মার্টফোন, ট্যাবলেট বা কম্পিউটারে যারা নতুন কিছু খেলতে চায়, তাদের কাছে এটি খুবই প্রিয়। খেলার পাশাপাশি, সেখানে টেক্সট চ্যাটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগও করা যায়।

রোব্লক্স প্ল্যাটফর্মের চরিত্র বা অ্যাভাটার 'ব্লকি' (Blocky), যা অনেকটা লেগো (Lego) ব্লকের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে সময়ের সঙ্গে রোব্লক্স চরিত্রের ধরনে পরিবর্তন এনেছে। মূলত দুই ধরনের অ্যাভাটার এখানে দেখা যায়। একটি ক্ল্যাসিক রোব্লক্স অ্যাভাটার। অন্যটি আধুনিক অ্যাভাটার (Rthro Style)। খেলোয়াড়েরা মাথায় কী পরবে, কী রঙের পোশাক বা শরীর হবে—সবকিছুই নিজের পছন্দমতো পাল্টে নিতে পারবে। প্রতি মাসে ৩৮ কোটির বেশি মানুষ একবার হলেও রোব্লক্স ব্যবহার করছে। গেমটির দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮ কোটি ৫৩ লাখের বেশি।

এখন রোব্লক্সের সেরা গেমগুলোর কথা বলি। প্রথম দিকেই আছে 'ব্রুকহেভেন'। যেখানে একটা ভার্চুয়াল শহরের মধ্যে নিজের পছন্দমতো চরিত্র সেজে ভূমিকা রাখতে হয়। সবার প্রিয় একটা গেম 'অ্যাডাপ্ট মি!'। যেখানে ভার্চুয়াল পোষা প্রাণী দত্তক নিয়ে তাদের দেখাশোনা করতে হয়। এ ছাড়া এই সপ্তাহে খুব জনপ্রিয় হয়েছে, এমন গেমগুলোর মধ্যে আছে 'ব্লক্স ফ্রুটস'। যেখানে তলোয়ার নিয়ে সুপারহিরোর মতো লড়াই করতে হয়। ফ্যাশন ও ড্রেসআপের গেম 'ড্রেস টু ইমপ্রেস' এবং মজার মাছ ধরার গেম 'ফিশ' এখন সবাই খেলে। মানে এখানে সব ধরনের গেমই আছে।

রোব্লক্স কিন্তু ইলেকট্রনিক আর্টস বা অ্যাকটিভিশন ব্লিজার্ডের মতো বড় বড় গেমিং কোম্পানির বানানো গেমের ওপর একদমই ভরসা করে না। গেম তৈরির জন্য তারা নির্ভর করে তোমাদের মতো সাধারণ ব্যবহারকারীদের ওপর। তাদের একটা দারুণ টুলস আছে, যার নাম রোব্লক্স স্টুডিও (Roblox Studio)। এটা ব্যবহার করে তুমি বা তোমার বন্ধুরা খুব সহজেই নিজেদের পছন্দের গেম বানিয়ে ফেলতে পারো। আর তোমার তৈরি করা গেমটি যদি জনপ্রিয় হয়, তাহলে সেই লাভের একটা অংশও তুমি পেতে পারো।

আগে গেম বানাতে গেলে কিন্তু কঠিন প্রোগ্রামিং ভাষা শেখা জরুরি ছিল। কিন্তু এখন রোব্লক্স স্টুডিওর মতো সফটওয়্যার আসার কারণে গেম তৈরি করাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। তুমি যদি কোডিং না-ও জানো, তবু এখানে তুমি তোমার স্বপ্নের গেম বানিয়ে ফেলতে পারো।

রোব্লক্স মূলত ছোটদের জন্য তৈরি হয়েছে। তাই এই প্ল্যাটফর্মটির একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বাবা-মায়েদের জন্য কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা (Parental Control) নিশ্চিত করা। এর ফলে অভিভাবকেরা সহজেই তাঁদের সন্তানের খেলার সময়, খরচ ও অন্যান্য কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করতে পারেন।

যদিও প্ল্যাটফর্মে অনেক মজার গেম আছে। তবু অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া বা গেমিং প্ল্যাটফর্মের মতো, কিছু খারাপ মানুষ রোব্লক্সকেও খারাপ কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এরা অনেক সময় প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তার নিয়ম বা মানুষকে নজরদারির জন্য রাখা সুরক্ষাব্যবস্থাকেও এড়িয়ে যায়। রোব্লক্সের কাছে ইউজারদের সুরক্ষা সবার আগে। তাই তারা নিরাপত্তা বজায় রাখতে সব সময়ই চেষ্টা করে। তাই খেলার সময় নিজেদেরও একটু সচেতন থাকতে হবে।

চোখ

তানভীর আহমেদ

আচ্ছা ভাই, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?
আপনার চোখে কালো কাপড় কেন? আপনি কি কানামাছি খেলতে আসছেন?
করুন।

সেটা আপনার না জানলেও চলবে।
আপনি নিজের কাজে মন দিন।

আরে ভাই, বলেন না,
ট্রেন কখন আসবে কে
জানে! আপনি অন্ধ হলে
চোখে কালো চশমা
থাকত। হাতে দেখি
আবার লাঠি। আপনি
যাবেন কই?

আমার কোনো
গন্তব্য নেই।

আর আমার কালো কাপড় বাঁধার
কারন আপনি শুনলেও বিশ্বাস
করবেন না। সুতরাং থাক।

আরে না না, আপনি
বলেন। পরিবেশটাও
গল্প শোনার মতোই।

আমি মৃত্যু দেখতে পারি।

মৃত্যু! বলেন, বলেন। তারপর?

উপহাস করলে করতে পারেন। কিন্তু সত্যিকে এক বিন্দুও বদলাতে পারবেন না।

আরে না না, আপনি গল্পটা বলেন।

এটা কোনো গল্প না, এটা একটা অভিশাপ। যেটাকে আমি গত দেড় মাস বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমি আর আমার বন্ধু ছিলাম ভ্রমণবিলাসী। দেশের আনাচে কানাচে ঘোরার পর...

এক গ্রামে এলাম। অন্য রকম সে জায়গা। এখানকার মানুষেরা আর পাঁচটা গ্রামের মানুষ থেকে একেবারেই আলাদা।

এখানকার মানুষদের মূল কাজ জাদুটোনা। নানা রকম অকাল্ট চর্চা আর নানা সব কাজকর্ম।

তাদের এই জীবনযাত্রা দেখতে লাগলাম...

একটু...আর একটু...

মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হয়ে উঠল। গ্রামের তন্ত্রসাধক মোড়ল আমাদের খুব আপন করে নিল।

এর মধ্যে ঘটল এক বিপদ।

কট!

আমার মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন মোড়ল ঠিক করলেন একটা শেষ চেষ্টা করবেন তিনি।

তিনি কী করেছিলেন তা আমি বা কেউই জানে না। আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর...

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন আমি আমার বাড়ির বিছানায়।

যাক, অবশেষে তোর ঘুম ভাঙল।

কিন্তু

তোর পেছনে ওটা কী?

কই? কিছু নেই তো। তোর এখনো ঘোর কাটেনি। চলি রে, কাল আবার আসব।

কিন্তু পরদিন ওর আর আসা হলো না। একটা অ্যাকসিডেন্ট আর সব শেষ।

আর তারপর থেকেই শুরু হলো এই অভিশাপের।

তারপর থেকে আমি দেখে গেছি মৃত্যুকে। সে তার শিকারের ঠিক পেছনের ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে। নিঃশব্দে!
আমি জানি না কোন শক্তির জন্য আমার দৃষ্টিশক্তি এমন হয়ে গেল। আমাকেই কেন হতে হলো এই মৃত্যুর মিছিলের সাক্ষী?
জীবনের মূল্য যে এত কঠিন তা বুঝলাম হাড়ে হাড়ে। মুক্তির রাস্তা খুঁজতে চোখগুলো বেঁধে ফেললাম কালো কাপড়ের আড়ালে।

হে হে!
একি! এ আপনি কী করলেন!
মৃত্যু দেখেন, তাই না? ব্যাটা গল্পবাজ!
আমার দিকে দেখেন তো... যতসব বুজরুকিতে দেশটা ভরে গেছে। আপনার ভণ্ডামি আমি বের করব আজ।
আমি
ভণ্ড
না

আরে! চোখ খুলেছে আমাদের শবচক্ষু! চোখগুলো এমন কেন ভাই? হা হা...ব্যাটা ধাপ্পাবাজ। কই, মরলাম না তো। আমি মরছি না কেন?

কত বড় ভুল করলে তা তুমি জানো না।

আমি কোনো ভুল করিনি, আমি শুধু...হাহ!

ভোঁ ও ও...
ট্রেন আসছে স্যার। উঠে আসেন। একি! আরেকজন স্যার ছিল, উনি কই?
ওনার আর যাওয়া হবে না।
শেষ

গণিতের চোখে মহাবিশ্ব

বিজ্ঞানীদের কাছে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার আছে। সেটি হলো গণিত। বিজ্ঞান মানে তত্ত্ব প্রমাণ করা। কাজটি করার জন্য বিজ্ঞানীরা গণিত ব্যবহার করেন। তারপর তত্ত্ব থেকে করেন ভবিষ্যদ্বাণী। সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে তত্ত্বটিও সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়।

গণিতের জগৎ

ষোড়শ শতকে ইতালির বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক গ্যালিলিও গ্যালিলি আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনাই সরল গণিত দিয়ে বর্ণনা করা যায়। ওপর থেকে পড়া বস্তু, সেতুর শক্তি বা গানের সুরের মতো অনেক বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। গ্যালিলিওর পর প্রায় সব বিজ্ঞানীই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন জিনিস কীভাবে কাজ করে, তা সঠিকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেন।

উদ্ভিদ প্রজনন প্রকল্প

জীবনের গণিত

অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী ও ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল আবিষ্কার করেন, জীবন্ত জিনিসের কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও সরল গণিত কাজ করে। যেমন ফুলের রং বা চোখের রঙের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো সম্ভাব্যতা মেনেই মা-বাবার কাছ থেকে সন্তানের কাছে স্থানান্তরিত হয়। গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের হাত ধরেই জেনেটিক্স বা বংশগতিবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল।

গ্যালিলিও জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণের জন্য শক্তিশালী টেলিস্কোপ তৈরি করেছিলেন। তিনি শত্রুপক্ষের জাহাজ শনাক্ত করার জন্য সামরিক বাহিনীর কাছেও কিছু টেলিস্কোপ বিক্রি করেন।

সরল সত্য

বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত গণিত মূলত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রমাণ ও ব্যবহার করার কাজে লাগত। কিন্তু এর পর থেকে গণিত নিজেই নতুন তত্ত্বের ধারণা দিতে শুরু করে। যখন একাধিক তত্ত্বের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তখন যেটি গাণিতিকভাবে সবচেয়ে সরল, সাধারণত সেটিই সঠিক হয়। আলবার্ট আইনস্টাইন সবচেয়ে সরল সমীকরণটি বেছে নিয়েই মহাকর্ষের সঠিক সূত্রটি খুঁজে পেয়েছিলেন।

শক্তিশালী যন্ত্র

গণিতবিদেরা শুধু হিসাব-নিকাশ করেন না। তাঁরা মূলত প্যাটার্ন খোঁজেন, নতুন ধারণা তৈরি করেন বা নতুন উপপাদ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এখন আমাদের কাজ করে দেওয়ার জন্য কম্পিউটার আছে। তাই হিসাব করা নিয়ে আর চিন্তা নেই। সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারকম্পিউটারগুলো যেকোনো মানুষের চেয়ে শত কোটি গুণ দ্রুত কাজ করতে পারে। যন্ত্রের এই অসাধারণ সংখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষমতার কারণে বিজ্ঞানীরা তত্ত্বগুলো আগের চেয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে পারেন।

কোনো কিছুই নিখুঁত নয়

অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী গণিতবিদ কার্ট গোডেল ১৯৩১ সালে একটি বৈপ্লবিক উপপাদ্য প্রকাশ করেন। তিনি দেখান, কোনো জটিল গাণিতিক তত্ত্ব কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এতে সব সময় কিছু ফাঁক থাকবে। তত্ত্বে এমন কিছু বিবৃতি থাকবে, যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এই আবিষ্কারের পর গণিতের জগৎ আর আগের মতো থাকেনি।

গণিতবিদ অধ্যাপক স্ট্যান গাডার বলেছেন, গণিত সহজ জিনিসকে জটিল করে না, বরং জটিল জিনিসকে সহজ করে।

হাউ টু বি আ ম্যাথ জিনিয়াস অবলম্বনে কাজী আকাশ

মাথা খাটাও

আড়ং ডেইরি
Milk for Good

১. লিমনকে তার ক্লাসের সবার জন্য নাশতা আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার ক্লাসে সেসহ মোট ১৩ শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের সবাইকে অবশ্যই সমানসংখ্যক বিস্কুট দিতে হবে। যদি একটি প্যাকেটে ১০৪টি বিস্কুট থাকে, তাহলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কয়টি করে বিস্কুট পাবে?

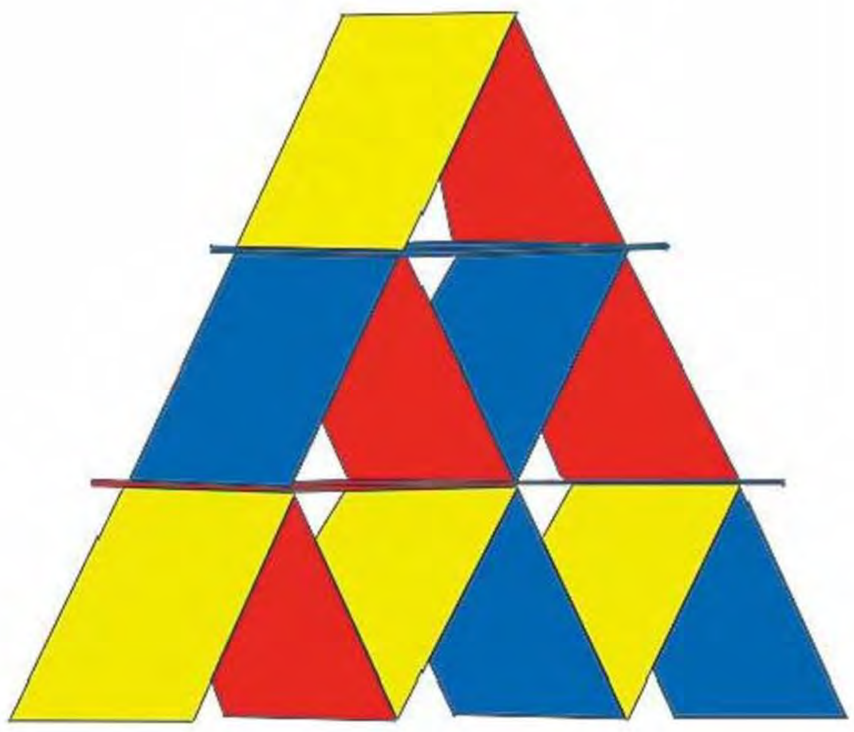

২. তিন বন্ধু উনো কার্ড দিয়ে টাওয়ার বানানোর চেষ্টা করছে। কে সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার বানাতে পারে, তা নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা। সামির টাওয়ারে ১২টি কার্ড আছে। ন্যান্সির টাওয়ারে সামির কার্ডের সংখ্যার সঙ্গে চার যোগ করে সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যত হয়, ততগুলো কার্ড আছে। জিয়াদের টাওয়ারে ন্যান্সির কার্ডের সংখ্যাকে তিন দিয়ে গুণ করে তা থেকে আট বিয়োগ করলে যত হয়, ততগুলো কার্ড আছে। কার টাওয়ারে সবচেয়ে বেশি কার্ড আছে?

৩. নওশীন প্রতিদিন ফ্রেঞ্চ শব্দ শিখতে পাঁচ মিনিট ব্যয় করে। শব্দগুলো একবার শিখে তা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখে। তারপর প্রতিটি শব্দ মনে করে বানান করার জন্য সে ৩০ সেকেন্ড সময় নেয়। যদি এভাবে সে ২০টি শব্দ শিখতে চায়, তাহলে তার মোট কত মিনিট লাগবে?

৪. একটি বাসে ৩২ যাত্রী আছে। প্রথম স্টপেজে পাঁচজন লোক বাস থেকে নেমে যায় এবং আটজন লোক ওঠে। পরের স্টপেজে বাসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাত্রী নেমে যায় এবং আরও চারজন ওঠে। তাহলে এখন বাসে মোট কতজন যাত্রী আছে?

গ্রন্থনা : **কিআ প্রতিবেদক**
অলংকরণ : সাফায়েত সাগর

৫. জেসিকা একটি দোকানে কিছু পোশাক কিনতে গেছে। সেখানে সবকিছুতে ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছিল। তবে পেমেন্ট নগদ টাকায় করলে প্রথম ছাড়ের পর আরও ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। ১০০০ টাকা দিয়ে পোশাক কিনলে, জেসিকাকে নগদ কত টাকা দিতে হবে?

মাথা খাটিয়ে বের করো গণিতের ধাঁধার উত্তরগুলো। তারপর নিচের কুপনটা পূরণ করে পাঠিয়ে দাও কিশোর আলোর ঠিকানায়। খামের ওপর অবশ্যই লিখবে : গণিতের ধাঁধা, কিশোর আলো। সেরা তিনজন বিজয়ীর জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। কুপনটি পাঠাতে হবে ২০ নভেম্বরের মধ্যে। চাইলে কিআর ই-মেইলেও উত্তর পাঠাতে পারো। তাহলে আজই বসে পড়ো গণিতের ধাঁধার সমাধানে।

গতবারের সমাধান

১. ২৫২

২. ১২। এখানে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম সংখ্যাগুলো (বিজোড়স্থানীয়) আছে যথাক্রমে ০, ২, ৪, ইত্যাদি। আবার জোড়স্থানীয় সংখ্যাগুলো হলো ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিবার ২ বাড়ছে। জোড়স্থানীয় অঙ্ক ১০-এর সঙ্গে ২ যোগ করলে হবে ১২।

৩. ২০টি। সে শুরুতে ৩ + ৭ = ১০টি আইসক্রিম বিক্রি করে। কিন্তু পরে আবার ১০টি আইসক্রিম দোকানে নিয়ে আসে। অর্থাৎ বিক্রি ০। মানে তার কাছে ২৫টি আইসক্রিম ছিল। এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানে ৫টি। তাহলে ২৫ - ২০ = ৫টি আইসক্রিম বিক্রি হয়েছে। বাকি রয়ে গেছে ২০টি।

৪. ৭ সপ্তাহ লাগবে। সে প্রতি সপ্তাহে জমাবে ৪০ টাকা। ৭ সপ্তাহে হবে ২৮০ টাকা (হেডফোনের দামের চেয়ে ১০ টাকা বেশি)।

৫. জুনে ৫০ কাপ, জুলাইয়ে ৫০ × ১.৫ = ৭৫ কাপ ও আগস্টে ৫০ × ২ = ১০০ কাপ। মোট = ৫০ + ৭৫ + ১০০ = ২২৫ কাপ

গণিতের ধাঁধা ৭৬-এর বিজয়ী

- **স্পর্শ মজুমদার**
  রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার
- **মো. নানজিব ফাহিম**
  বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা
- **জারিন তাসনিম আনজুম সারাহ**
  বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

‘গণিতের ধাঁধা ৭৭’-এর উত্তর পাঠাও

নাম .....

বয়স ..... শ্রেণি..... ফোন .....

স্কুল-কলেজ .....

ঠিকানা .....

.....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়

গণিতের ধাঁধা

কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ই-মেইল : **editor@kishoralo.com**

আড়ং ডেইরি
Milk for Good

রকিব হাসানকে স্মরণ করে কিশোর আলোর অনলাইন আড্ডা

অক্টোবর মাসে অনলাইন কিআড্ডা অনুষ্ঠিত হয় ২৫ অক্টোবর শনিবার। সভার শুরুতেই স্মরণ করা হয় সম্প্রতি প্রয়াত *তিন গোয়েন্দার* লেখক রকিব হাসানকে। এরপর বই পড়া নিয়ে আলোচনা চলে। এক পাঠক প্রশ্ন করে, আমরা কি কিশোর আলোর বুক ক্লাব খুলতে পারি? কিশোর আলোর সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত জানান, বই পড়লে অবশ্যই বই নিয়ে আলোচনা ও গল্পের সুযোগ থাকা দরকার। কিশোর আলো বুক ক্লাব আগের মতো আবারও চালু করা যায়।

কিশোর আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের ও কিশোর আলোর ইভেন্ট টিমের সদস্য আব্দুল ইলা সিলেট থেকে সভায় যোগ দেন। অংশ নেন কিশোর আলোর ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর নওশিন শারমীন। সিলেটের বুক শপ বাতিঘরের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখান আব্দুল ইলা।

এরপর স্কুল ও কোচিং নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সভায় অংশ নেওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, মন চাইলে তারা স্কুলে যায়। তবে নিয়মিত কোচিং করতে হয় তাদের। অনেকেই প্রতিদিনই কয়েকটি কোচিংয়ে ক্লাস করে। এরপর আলোচনা ঘুরে যায় সংবাদপত্রের খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। কয়েকজন জানায়, তারা এখন আর সব সংবাদে বিশ্বাস করে না। মানুষ কী নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা করছে, সেটা দেখে সঠিক খবর বোঝার চেষ্টা করে তারা। এসব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কিআ নিয়ে আলাপ হয়। সবশেষে কিআ পাঠকদের জন্মদিন কবে জেনে শেষ হয় অক্টোবরের অনলাইন সভা।

কিআ প্রতিবেদক

ঢাকা কলেজে তৃতীয় জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত

ঢাকা কলেজে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত হয়েছে জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব। এই উৎসবের আয়োজন করেছে ঢাকা কলেজ কালচারাল ক্লাব। ২৭ ও ২৮ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এই উৎসবের শিরোনাম ছিল 'থার্ড ডিসিসিসি ন্যাশনাল কালচারাল ফিয়েস্তা-২০২৫'।

সংস্কৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরতে এবং শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে এই আয়োজন। ছিল অনলাইন ও অফলাইনে মোট ২৩টি পর্ব। অনলাইনে দেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। এ ছাড়া ঢাকার ৫০টির বেশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা কলেজ অডিটরিয়ামে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল ক্রিয়েটিভ রাইটিং, মুভি রিভিউ, ইফ ইউ ওয়্যারের মতো চমৎকার আয়োজন। পাশাপাশি নৃত্য, গান, থিয়েটার, ফটোগ্রাফি, ওয়াল ম্যাগাজিনের মতো আয়োজনও ছিল। এ ছাড়া ছিল ক্র্যাক দ্য রিডল, বেলুন পপ অ্যাক্ট, ট্রেজার হান্ট ও পাস দ্য কার্ড।

পাশাপাশি ছিল পাপেট শো ও সেলিব্রিটি টক। ক্লাবের নিজস্ব ক্ল্যাসিক্যাল পরিবেশনা, কলেজ ব্যান্ড শঙ্খচিলের সংগীত এবং ব্যান্ড কালকূটের প্রাণবন্ত পরিবেশনা দর্শক-অতিথিদের মুগ্ধ করেছে। দ্বিতীয় দিনে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আয়োজনের ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।

কিআ প্রতিবেদক

টুকরো মেলাও ৫০

নিচের অলংকরণটির যে অংশগুলো নেই, সেগুলো মেলানোর চেষ্টা করো।

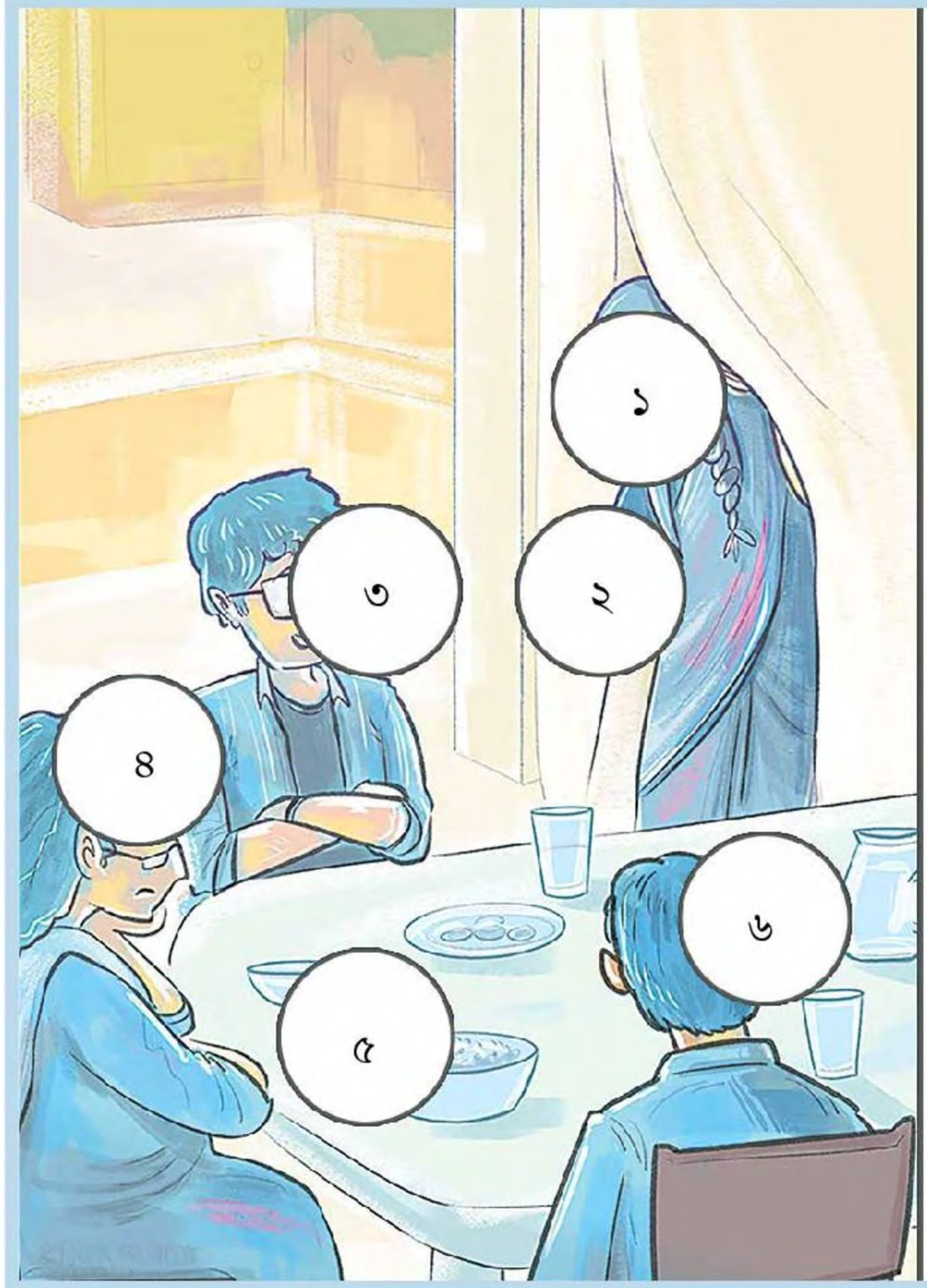

ক

খ

গ

ঘ

ঙ

চ

কাকুরো ৫০

এখানে সাদা খালি অংশে তোমাকে এমন অঙ্ক বসাতে হবে, যেগুলোর লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি যোগফল হবে ধূসর ঘরে থাকা সংখ্যার সমান। এ ক্ষেত্রে ধূসর ঘরের দাগের ওপরে সংখ্যা থাকলে তা হবে ডানের অঙ্কগুলোর যোগফল। আবার ধূসর ঘরের দাগের নিচে সংখ্যা থাকলে তা হবে নিচের অঙ্কগুলোর যোগফল। লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবারই বসানো যাবে।

	৪	৩০	১০	
১২				
১১				৪
	১০			
	১৫			

কে ভিন্ন ৫০

চারটি ছবি দেওয়া আছে এখানে। বলো তো, এগুলোর মধ্যে কোনটি ভিন্ন এবং কেন?

ছায়াছবির ছায়া চেনা ৫০

নিচের ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ করো। পাশের কোন ছায়াটি ছবির সঙ্গে মেলে?

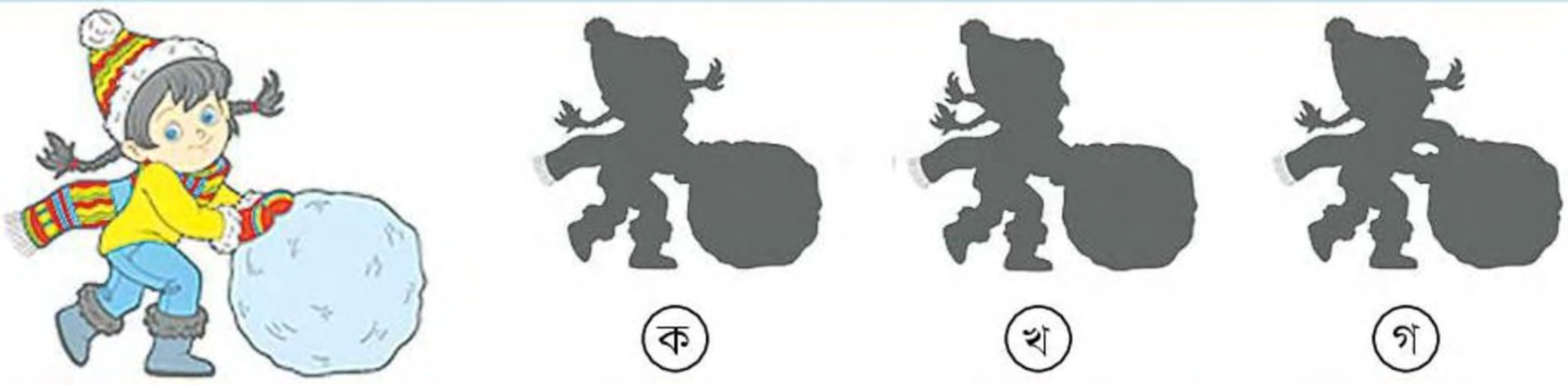

খেলাধুলা জিজ্ঞাসা ৭১

১. **সর্বশেষ এল ক্লাসিকো জিতেছে কোন দল?**
ক. বার্সেলোনা
খ. রিয়াল মাদ্রিদ
গ. ড্র

২. **নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশ একমাত্র জয় পেয়েছে কোন দলের বিরুদ্ধে?**
ক. দক্ষিণ আফ্রিকা
খ. পাকিস্তান
গ. ভারত

৩. **সর্বশেষ বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওডিআই সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহ করেছেন কে?**
ক. রিশাদ হোসেন
খ. মেহেদী হাসান মিরাজ
গ. নাসুম আহমেদ

খেলাধুলা জিজ্ঞাসা ৭০-এর উত্তর

১. খ. ভারত
২. গ. আইতানা বোনমাতি
৩. ক. নোয়াহ লাইলস

ছায়াছবির ছায়া চেনা ৪৯-এর উত্তর

কে ভিন্ন ৪৯-এর উত্তর

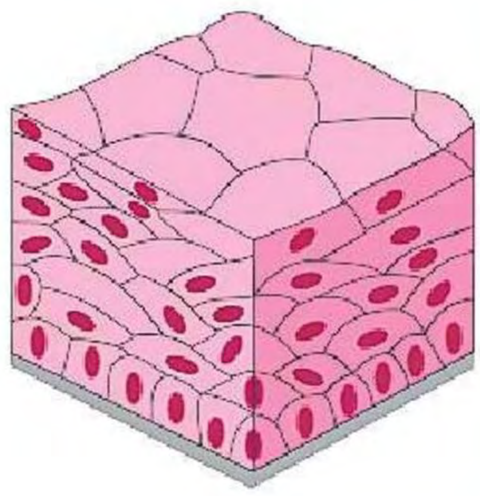

সুডোকু ৮১

	৯							
					৩			
৬		৭					২	৫
১	৪	৯			৭	৫		
		৩	১	৯			৮	
৭				৪	২	৬	৯	
	৩		২		৮	৯		
৯				৩				৭
		২	৬	৫				

নিয়মাবলি

ছকটি খাতায় এঁকে খালি ঘরে সংখ্যাগুলো বসিয়ে পাঠাও।

সংখ্যার পিরামিড ৫০

ফাঁকা ঘরে এমনভাবে সংখ্যা বসাও যেন নিচের দুই ছকে থাকা সংখ্যার যোগফল হয় ওপরের সংখ্যা।

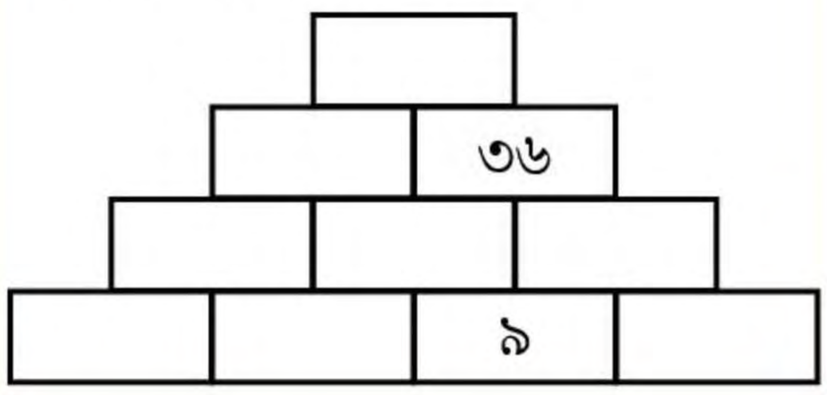

সংখ্যার পিরামিড ৪৯-এর উত্তর

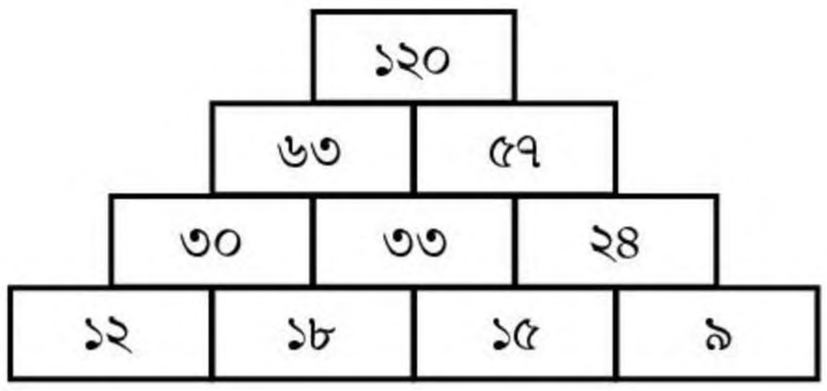

কাকুরো ৪৯-এর উত্তর

	৪	২৪		
১২	৩	৯	৭	
১১	১	৮	২	৩
	১২	৭	৪	১
		৩	১	২

কুইজের উত্তর পাঠাও

কুইজের উত্তর চাইলে সব একসঙ্গে পাঠাতে পারো। অথবা তুমি যেগুলোর উত্তর পারো, সেগুলো আলাদা করে আলাদা কাগজেও লিখে পাঠাতে পারো। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা, মুঠোফোন নম্বর লিখতে হবে। এই কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠাতে হবে তোমার লেখা উত্তরের সঙ্গে। কুপনের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবে রকমারি-এর সৌজন্যে ২০০ টাকার বই। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ **২০ নভেম্বর**। ই-মেইলে পাঠানো উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়।

নাম .....

শ্রেণি.....

ফোন .....

স্কুল-কলেজ .....

.....

পূর্ণ ঠিকানা .....

.....

.....

.....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়

কুইজ

কিশোর আলো

১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সুডোকু ৮০-এর উত্তর

২	৫	১	৭	৮	৪	৬	৯	৩
৩	৮	৬	৫	৯	১	২	৭	৪
৪	৭	৯	৩	৬	২	৫	১	৮
৯	৩	৭	৮	১	৬	৪	২	৫
৫	২	৮	৪	৩	৭	৯	৬	১
১	৬	৪	৯	২	৫	৮	৩	৭
৮	১	৩	২	৫	৯	৭	৪	৬
৬	৪	২	১	৭	৮	৩	৫	৯
৭	৯	৫	৬	৪	৩	১	৮	২

কিআ কিশোর আলো

অক্টোবর সংখ্যার

কুইজ বিজয়ী

তোমাদের পাঠানো অনেক উত্তরের মধ্য থেকে লটারিতে এই ২৪ জনের নাম উঠে এসেছে। তোমরা প্রত্যেকে পাবে রকমারি.com-এর সৌজন্যে ২০০ টাকার বই।

টুকরো মেলাও

- **ত্বাহা বিন মামুন**, দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
- **সাজিদ আহমেদ**, নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা
- **সুরাইয়া সরকার**, বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল, কুড়িগ্রাম

কে ভিন্ন

- **ফারজিদ**, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **মুহাম্মদ আকিল**, দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
- **নাবিহা ফাইজা**, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

খেলাধুলার জিজ্ঞাসা

- **মো. আফনান হাসান**, চাইল্ড ল্যাবরেটরি স্কুল, নারায়ণগঞ্জ
- **নাফিউ লিয়া**, শৈশব স্মৃতি কিন্ডারগার্টেন, নরসিংদী
- **মোহাম্মাদ বায়জীদ হোসেন**, সুলতাননগর কওমি মাদ্রাসা, রংপুর

ছায়াছবির ছায়া চেনা

- **আলোফা তাহ্‌ফীম**, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **মেহজাবিন নূর অর্পা**, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **মেহেরুমা**, গোসিংগা উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর

কাকুরো

- **নিহাল আহমেদ**, সেন্ট যোসেফ উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা
- **মো. মেহেদী হাসান**, হাজী বায়েন উদ্দিন পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর
- **মো. ইফাদ আমীন**, রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর

সুডোকু

- **মো. আজমাঈন ফাইয়াজ**, করতোয়া কালেক্টরেট আদর্শ শিক্ষা নিকেতন, পঞ্চগড়
- **মো. রাকিবুল ইসলাম**, সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া
- **কানিশা তাবাসসুম**, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঠাঁকুরগাও

সংখ্যার পিরামিড

- **তাইয়েবা ইসলাম**, ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ভোলা
- **মো. কাসেম**, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, নারায়ণগঞ্জ
- **মেহের নিগার**, নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নেত্রকোনা

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে

- **নাবিহা তাইয়্যেবা**, তানজিমুল উম্মাহ গার্লস মাদ্রাসা, ফেনী
- **নাওহান নেওয়াজ**, দাউদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যশোর
- **মাহমুদ শাফি**, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া

গত সংখ্যার উত্তর

টুকরো মেলাও ৫০-এর উত্তর :

১. ঙ ২. চ
৩. খ ৪. ক
৫. ঘ ৬. গ

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে ১২৬-এর উত্তর :

১. ঈশান মজুমদার
২. ইতালি
৩. ১১০টির বেশি

১২৭

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পাঠাও।

১. লাখ টাকার কুইজে ল্যাপটপ বিজয়ীর নাম কী?

২. রকিব হাসান কত তারিখে মারা গেছেন?

৩. সাতোরুর মায়ের নাম কী?

কিশোর আলোর
গ্রাহক হও

৬০০ টাকা দিয়ে এক বছরের এবং ৩০০ টাকা দিয়ে ছয় মাসের গ্রাহক হলে কোনো ডেলিভারি চার্জ ছাড়াই ঘরে বসে পেয়ে যাবে কিশোর আলোর পরবর্তী সংখ্যাগুলো।

গ্রাহক হতে ভিজিট করো
https://subscription.palobd.com

অথবা কল করো ০৯৬৬৬-৭০১০৭০ নম্বরে
(ছুটির দিন ছাড়া যেকোনো দিন
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

কিআ কিশোর আলো

Reedisha™

ILUBILU

Wafer

মিল্ক, স্ট্রবেরী, চকলেট ও বাবল গাম

মজাদার চারটি ভিন্ন স্বাদে
রিদিশা ইলুবিলু ওয়েফার
এখন আপনার হাতের কাছে ...

প্রতি প্যাকেটে থাকছে
আকর্ষণীয় স্টিকার

Reedisha™
সবার স্বাদ বোঝে ...

মমতায় বাড়াই
সম্পর্কের গভীরতা

৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কগুলোকে মমতায় ঘিরে রেখেছে তীর।
তাইতো সরিষার তেল থেকে শুরু করে রেডি মিক্স পর্যন্ত সবকিছুতেই
বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কখনোই আপস করেনি তীর।

ভিডিওটি দেখতে স্ক্যান করুন
www.citygroup.com.bd /TEER1972